চৌন্তাই রঘুপতি বলিলেন "আমি এ কি স্বপ্ন দেখিতেছি!"

রাজা বলিলেন "না ঠাকুর, এতদিন আমরা স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম, আজ আমাদের চেতনা হইয়াছে। একটি বালিকার মূর্ত্তি ধরিয়া মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গেছেন, করুণাময়ী জননী হইয়া মা তাঁহার জীবের রক্ত আর দেখিতে পারেন না!"

রঘুপতি কহিলেন "মা তবে এতদিন ধরিয়া জীবের রক্তপান করিয়া আসিতেছেন কি করিয়া?"

রাজা কহিলেন "না, পান করেন নি। তোমরা যখন রক্তপাত করিতে তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।"

রঘুপতি বলিলেন "মহারাজ, রাজকার্য্য আপনি ভাল বুঝেন সন্দেহ নাই। কিন্তু পূজা সম্বন্ধে আপনি কিছুই জানেন না। দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত, আমিই আগে জানিতে পারিতাম।"

নক্ষত্র মাণিক্য অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "হাঁ, এ ঠিক কথা! দেবীর যদি কিছুতে অসন্তোষ হইত ঠাকুর মহাশয়ই আগে জানিতে পাইতেন।"

রাজা বলিলেন "হৃদয় যার কঠিন হইয়া গিয়াছে দেবীর কথা সে শুনিতে পায় না।"

নক্ষত্রমাণিক্য পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিলেন—ভাবটা এই যে, "এ কথার একটা উত্তর দাও!"

রঘুপতি আগুন হইয়া উঠিয়া বলিলেন "মহারাজ আপনি পাষণ্ড নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন।"

নক্ষত্র মাণিক্য প্রতিধ্বনির মত বলিলেন "হাঁ নাস্তিকের মত কথা কহিতেছেন!"

গোবিন্দ মাণিক্য উদ্দীপ্তমূর্ত্তি পুরোহিতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠাকুর, রাজসভায় বসিয়া আপনি মিথ্যা সময় নষ্ট করিতেছেন। মন্দিরের কাজ বহিয়া যাইতেছে। আপনি মন্দিরে যান। যাইবার সময় পথে প্রচার করিয়া দিবেন যে, আমার রাজ্যে যে ব্যক্তি দেবতার নিকট জীব বলি দিবে তাহার নির্ব্বাসন দণ্ড হইবে।"

তখন রঘুপতি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া পৈতা স্পর্শ করিয়া বলিলেন "তবে তুমি উচ্ছন্ন যাও—" চারিদিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া সভাসদগণ পুরোহিতের উপর গিয়া পড়িলেন। রাজা ইঙ্গিতে সকলকে নিষেধ করিলেন, সকলে সরিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি বলিতে লাগিলেন "তুমি রাজা তুমি ইচ্ছা করিলে প্রজার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে পার তাই বলিয়া তুমি মায়ের বলি হরণ করিবে বটে! কি তোমার সাধ্য! আমি রঘুপতি মায়ের সেবক থাকিতে কেমন তুমি পূজার ব্যাঘাত কর দেখিব!"

মন্ত্রী রাজার স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছেন। তিনি জানেন সঙ্কল্প হইতে রাজাকে শীঘ্র বিচলিত করা যায় না। তিনি ধীরে ধীরে সভয়ে কহিলেন "মহারাজ, আপনার

স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ বরাবর দেবীর নিকটে নিয়মিত বলি দিয়া আসিতেছেন। কখনও একদিনের জন্য ইহার অন্যথা হয় নাই।" মন্ত্রী থামিলেন।

রাজা চুপ করিয়া রহিলেন। মন্ত্রী বলিলেন আজ এত দিন পরে "আপনার পিতৃ-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত সেই প্রাচীন পূজার ব্যাঘাত সাধন করিলে স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইবেন।"

মহারাজা ভাবিতে লাগিলেন। নক্ষত্রমাণিক্য বিজ্ঞতাসহকারে বলিলেন "হাঁ, স্বর্গে তাঁহারা অসন্তুষ্ট-হইবেন!"

মন্ত্রী আবার বলিলেন "মহারাজ, এক কাজ করুন, যেখানে সহস্র বলি হইয়া থাকে সেখানে একশত বলির আদেশ করুন!"

সভাসদেরা বজ্রাহতের মত অবাক হইয়া রহিল, গোবিন্দমাণিক্যও বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ পুরোহিত অধীর হইয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

এমন সময়ে কেমন করিয়া প্রহরীদের হাত এড়াইয়া খালি গায়ে খালি পায়ে একটি ছোট ছেলে সভায় প্রবেশ করিল। রাজসভার মাঝখানে দাঁড়াইয়া রাজার মুখের দিকে বড় বড় চোখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়!"

বৃহৎ রাজসভার সমস্ত যেন সহসা নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দীর্ঘগৃহে কেবল একটি ছেলের কণ্ঠধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল "দিদি কোথায়!"

রাজা তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে নামিয়া ছেলেকে কোলে করিয়া দৃঢ়স্বরে মন্ত্রীকে বলিলেন "আজ হইতে আমার রাজ্যে বলিদান হইতে পারিবে না। ইহার উপর আর কথা কহিও না!"

মন্ত্রী কহিলেন "যে আজ্ঞে!"

তাতা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল "দিদি কোথায়!"

রাজা বলিলেন "মায়ের কাছে!"

তাতা অনেকক্ষণ মুখে আঙুল দিয়া চুপ করিয়া রহিল, একটা যেন ঠিকানা পাইল এম্‌নি তাহার মনে হইল। আজ হইতে রাজা তাতাকে নিজের কাছে রাখিলেন। খুড়ো কেদারেশ্বর রাজবাড়িতে স্থান পাইল।

সভাসদেরা আপনা-আপনি বলাবলি করিতে লাগিল "এ যে মগের মুল্লুক হইয়া দাঁড়াইল। আমরাত জানি বৌদ্ধ মগেরাই রক্তপাত করে না, অবশেষে আমাদের হিন্দু-দের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

নক্ষত্রমাণিক্যও তাহাদের মতে সম্পূর্ণ মত দিয়া কহিলেন "হাঁ, শেষে হিন্দুদের দেশেও কি সেই নিয়ম চলিবে না কি!"

সকলেই ভাবিল অবনতির লক্ষণ ইহা হইতে আর কি হইতে পারে! মগে হিন্দুতে তফাৎ রহিল কি?

ক্রমশঃ।

লাঠালাঠি।

সম্পাদক মহাশয়—

আপনার বৈশাখ মাসের বালক লাঠি হাতে করিয়া বাহির হয়; জ্যৈষ্ঠ মাসের বালক লাঠির উপর লাঠি মারিয়াছে। দুই জন না একত্র হইতে হইতেই লাঠালাঠি আরম্ভ হইয়াছে ইহা তাহাদের স্বভাব সুলভ অভিমানের পরিচয়। আপনি বালকের হাতে লাঠি দিয়া ভাল কায করেন নাই; একে বাঙ্গালির ছেলে তায় লাঠি হাতে পড়িয়াছে, ঘোর বিপ্লব হইবার সম্ভাবনা!

যদিও আমি কালের বাৎসরিক আবর্ত্তে পড়িয়া বাল্যাবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি কিন্তু কিছু দিন পূর্ব্বে যে বালক ছিলাম তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন ও কি রূপে যে অবস্থান্তর ঘটিল বলিতে পারি না। শুধুই কি বয়োন্নতির পর্য্যায়ক্রমে, বালক যুবক, যুবক প্রৌঢ়, ও প্রৌঢ় বৃদ্ধ হয়? আমার বোধ হয় তাহা নহে; অন্নের চিন্তা ও সংসারের ভাবনাই অধিকাংশ বালককে বৃদ্ধ করিয়া ফেলে। যিনি চিরকাল সংসারে বালক রহিলেন তিনিই ধন্য। তাঁহাকে দেখিলেও পুণ্য আছে!

একে বহু পরিবার তায় গরিবের ছেলে, আমাদের পাশের ভাবনা ভাবিবারও সময় ছিল না—অন্ন চিন্তাই বলবতী! আজকাল সকল গ্রামে ও সকল বিদ্যালয়েই একটু আদটু ব্যয়াম চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে; বালকগণের শারীরিক উন্নতি দেখিয়া বড়ই আমোদ হয় ও তদসঙ্গেসঙ্গে বেশ আশার সঞ্চারও হইয়া থাকে। আমিও পাঠ্যাবস্থায় নিয়মিতরূপে চর্চ্চা করিয়া দুই চারি বৎসর মধ্যে দিব্বি হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিলাম; লাঠি মুগুর, ক্রকেট, কিছুই বাকি ছিল না। বড়ই আমোদে দিন্ কটিয়াছিল। পরে ইহ জগতে আসিয়া অনেকের যাহা প্রার্থনা, ঈশ্বর কৃপায় আমার অদৃষ্টে তাহা শীঘ্র শীঘ্রই ঘটিয়া গেল—অধিক পরিশ্রম করিতে হইল না; অল্প বয়সেই বাড়ির কর্ত্তা হইতে হইল! ভিটায় আর সরস্বতী বসিলেন না ধুল্ পায়েই সরিয়া পড়িলেন্! লক্ষ্মীরও উদ্দেশ দেখিতেছি না।

আমাদের পল্লিগ্রামে বাড়ি। কলিকাতা হইতে তিন ক্রোশ উত্তরে। বৎসরান্তে একবার পূজার সময় বাবার সঙ্গে জুতা কিনিতে যাইতাম। কলিকাতা যাইবার সাধটা চিরকালই প্রবল ছিল এক্ষণে তাহা মিটিবার উপায় হইল! এত দিন পূজার সময় ভিন্ন দুর্গা নাম মুখে আসে নাই এখন প্রতি দিন দুর্গা নাম করিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হইতে লাগিল!

চাকুরির নিতান্ত আবশ্যক, তাড়াতাড়ি স্নানান্তে দুই এক গ্রাস কষ্টের অন্ন উদরস্থ করিয়া পদব্রজে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে লাগিলাম। আটটা না বাজিতে গৃহ ত্যাগ করি—আবার রাত্র ৯টার সময় ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাড়ি ফিরি—চাকুরী আর মেলে না। কলিকাতায় একদণ্ও বসিতে পাই না, বসিলেই পরিচয় দিতে হয়—তাহাও ইচ্ছা করি না। চেনা শুনা লোক কেহ নাই, কাযেই মুচ্ছুদ্দি গোছের পাগড়ি

দেখিলেই মুরুব্বি ধরিয়া বসি—কল কেবল বাক্য ব্যয়! সাহেবদের কাছে যাব কি দ্বারবান চৌকাট পার হতে দেয় না। পথকষ্টে দারুণ ক্ষুধায় মনোদুঃখে আবার সেই কষ্টের সংসারে আসিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়ি। ভাবনায় চিন্তায় অনাহারে অম্লরোগ জন্মিল। মা একটু চুনের জল শিশি করিয়া দেন, মধ্যে মধ্যে তাহাই উপলক্ষ করিয়া অম্ল দমন করি। এইরূপে অসুখে অনিদ্রায় দেহ ক্রমশ ক্ষীণ হইতে লাগিল। পাঠ্যাবস্থার জলন্ত উৎসাহ সঞ্চিত আশা সব একে একে আপনাদিগের পথ দেখিতে লাগিল। প্রতি দিন কলিকাতা হইতে বাড়ি আসিলে সকলেই আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করে "কিছু সুবিধা হোল কি?" আমি নিরুত্তর। তাহারাও বুঝিয়া লয় "সংবাদ কুশল নয়।" এইরূপে দিন দিন কষ্ট বাড়িতে লাগিল, কনিষ্ঠের লেখাপড়ার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মিল; আর বেকার অবস্থায় অন্নই বা জোটে কিরূপে!

এদিকে হরি কালিঘাটের কালি ও বাবা তারকনাথ সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবতাগণের নিকট আমার মা, অল্পদিন মধ্যে ধারে অনেক মানসিক করিয়া ফেলিলেন। আর উট্‌নো চলেনা; সুদ বাড়িলে সংসারটা মাটি হইয়া যাইবে যেন এই ভাবিয়া জগদীশ্বর কোম্পানীর ঘরে আমার একটি ৩০ টাকা বেতনের চাকুরী জোগাড় করিয়া দিলেন—পরীক্ষা দিয়া প্রবেশ করিলাম। বালক কালে দেখিতাম বাবুগণ আল্‌পাকার চাপকান সাদা পেণ্টুলেন, পাকান চাদর, এল্‌বার্ট চেন, ফেরান চুল, চক্‌চকে জুতো ও রঞ্জিত ঠোঁট, লইয়া আপিসে যান—এখন তাঁহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া চক্ষে জল আসিল।

আমি উদয় অস্ত খেটেও কাহার মুখে হাসি দেখতে পাইনা—যাহা হউক ঈশ্বর কৃপায় কষ্টে শ্রেষ্টে ৩০ টাকায় একরূপ সঙ্কুলন হইতে লাগিল। কিন্তু ডাক্তারের ফি বা ঐরূপ অন্য কোন উপসর্গ হইলেই চারিদিক অন্ধকার দেখি। এক্ষণে আর হাঁটিয়া আপিসে যাই না নৌকায় যাতায়াত করি। প্রাতে উঠিয়া গৃহকার্য্য দেখিয়া আপিসে যাই আবার রাত্র ৯ টার সময় বাড়ি আসি। ইহার মধ্যে এমন স্ফূর্ত্তি পাই না যে ব্যায়াম চর্চ্চা করি। এরূপ অন্নকষ্টের অবস্থায় চুরী ডাকাইতীর জন্যই লাঠি ঘোরান সম্ভব যিনি স্ফূর্ত্তির জন্য ঘোরান আমি তাঁহাকে আশুতোষ বলিতে প্রস্তুত আছি! বলিতে পারেন তোমার ন্যায় কয়জনের অবস্থা? আমি বলি আমার ন্যায় ১০ আনার অধিক, তবে একটু উনিশ বিশ আছে।

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ব্যায়াম চর্চ্চা করিতাম—এক্ষণে তাহা নাই, কাযেই পূবে বাতাস দিলেই গা হাত পা কামড়ায়, বাতে ধরিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। আমার দুইটি অসুরের মত বন্ধু ব্যায়ামে ব্যাঘাত হওয়াতে ১৮, ১৯ বৎসর বয়সে ক্ষয়কাশে প্রাণত্যাগ করিল। আরো গুটিকতক সংসারের জ্বালায় জলিয়া পুড়িয়া শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে—আর ব্যায়াম চর্চ্চা নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শুনিতে পাই "কি খাইয়া চর্চ্চা করি—ব্যায়ামে ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, আমাদের কমিলে বাঁচি!" হায় কি শোচনীয় কথা কি দুরদৃষ্ট!

আর এক কথা, দেশের এখনো যেরূপ ভাবগতিক দেখিতেছি— তাহাতে বেকার অবস্থায় ব্যায়াম চর্চ্চা করিলে নানা কথা শুনিতে হয় ও অপ্রিয় হইতে হয়। যদিও তাহা মারাত্মক নহে, কিন্তু লোকের ও সমাজের প্রিয় হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে বলুন কোন্ পথে যাই।

আমি ব্যায়ামের বিরোধী নহি—ব্যায়াম চর্চ্চা যত অধিক হয় ততই ভাল—কিন্তু নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। তবে যে এতক্ষণ বিরক্ত করিলাম তাহা কেবল সন্দেহ দূরীকরণার্থ, কোনরূপে কিছু শিক্ষা ও সংগ্রহ হইলেই বাধিত হইব। প্রথমেই বলিয়াছি আমি স্বয়ং ভুগিতেছি, অতএব যাহা লিখিলাম তাহা অমূলক নহে—উপন্যাসও নহে।

তবে এ ব্যাঘাত নিবারণের এক উপায় আছে বোধ করি তাহা হইলে সুখী হওয়া যায়। যেরূপ বাল্যাবস্থায় ব্যায়ামের চর্চ্চা হইতেছে—তৎসঙ্গেসঙ্গে আবশ্যকীয় শিল্পকার্য্য শিক্ষা হওয়া উচিত। যাহাতে কেহ ছুতারের, কেহ কামারের কেহ স্বর্ণকারের, কেহ ঘড়ির, কেহ লোহাখানার প্রভৃতি কার্য্য শিখিতে পারে তাহার পথ প্রশস্ত হউক, তাহা হইলে চিরকাল স্বাধীন পরিশ্রমে, আনন্দে ও নূতন নূতন উৎসাহে দিনপাত করিতে পারিব। নতুবা সকলেই টাকিয়া আছি কেরাণী হইব—পূর্ণমাত্রায় দাসত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইব; পোরের ভাত ও ধোয়ামুগের ডালের একটু নুনলঙ্কাবিবর্জ্জিত ঝোল খাইয়া অম্ল ও অজীর্ণ দমন করিব—এরূপ অবস্থায় কয়জনের ব্যায়াম চর্চ্চায় স্ফূর্ত্তি জন্মায়? তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম আমরা কোন পথে যাই!

অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রোক্ত বিষয়ে কিছু উপদেশ দান করিলে বড়ই উপকৃত হইব, ও সেই আশাতেই আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আর অধিক বাড়াবাড়ি করিয়া বিরক্ত করিব না; সূর্য্যদেবও উদয় হন্ হন্—আপিসের জন্য প্রস্তুত হইগে।

বশম্বদ

দক্ষিণেশ্বর শ্রী কেদার—

শ্রীচরণেষু।

শ্রীচরণ কমল যুগলেষু। হল ত! আরও ভক্তি চাই! যুগলের উপর আরও এক যোড়া বাড়াইয়া দিব! দাদা-মহাশয়, তোমার অন্ত পাওয়া ভার, চিরকাল তুমি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করিয়া আসিয়াছ, আর আজ হঠাৎ ভক্তি আদায়ের জন্য এক পরোয়ানাপত্র বাহির করিয়াছ, ইহার অর্থ কি! আমি দেখিয়াছি, যে অবধি তোমার সুমুখের এক যোড়া দাঁত পড়িয়া গিয়াছে সেই অবধি তোমার মুখে কিছুই বাধে না। তোমার দাঁত গিয়াছে বটে কিন্তু তীক্ষ্ণ ধারটুকু সে তোমার জিভের আগায়

রাখিয়া গিয়াছে। এখন আর আগেকার মত পরমানন্দে কই মাছের মুড়া চিবাইতে পার না, সুতরাং দংশন করিবার সুখ তোমার নিরীহ নাতিদের কাছ হইতে আদায় কর। তোমার দন্তহীন হাসিটুকু আমার বড় মিষ্ট লাগে, কিন্তু তোমার দন্তহীন দংশন আমার তেমন উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় না।

তোমাদের কালের সবই ভাল, আমাদের কালের সবই মন্দ এইটে তুমি প্রমাণ করিতে চাও—এ সম্বন্ধে আমার দুয়েকটা কথা বলিবার আছে তাহাতে যদি তোমাদের আদবকায়দার কোন ব্যতিক্রম হয় তবে আমাকে মাপ করিতে হইবে। আমরা যাহাই করি তাহাই তোমাদের চক্ষে বেয়াদবি বলিয়া ঠেকে এই জন্যই ভয় হয়! তোমরা চোখে কম দেখ, কিন্তু নাতিদের একটি সামান্য ত্রুটি চষমা না লইয়াও বেশ দেখিতে পাও।

যে লোক যে কালে জন্মগ্রহণ করে সে কালের প্রতি তাহার যদি হৃদয়ের অনুরাগ না থাকে তবে সে-কালের উপযোগী কাজ সে ভাল করিয়া করিতে পারে না। যদি সে মনে করে যে-কাল গেছে তাহাই ভাল, আর আমাদের কাল অতি হেয়, তবে তাহার কাজ করিবার বল চলিয়া যায়, ভূতকালের দিকে শিয়র করিয়া সে কেবল স্বপ্ন দেখে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে এবং ভূতত্ব প্রাপ্ত হওয়াই সে একমাত্র বাঞ্ছনীয় মনে করে। স্বদেশ যেমন একটা আছে স্বকালও তেমনি একটা আছে। স্বদেশকে ভাল না বাসিলে স্বদেশের কাজ করা যায় না, তেমনি স্বকালকে ভাল না বাসিলে স্বকালের কাজও করা যায় না। যদি ক্রমাগতই স্বদেশের নিন্দা করিতে থাক, স্বদেশের কোন গুণই দেখিতে না পাও, তবে স্বদেশের উপযোগী কাজ তোমার দ্বারা ভাল রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। কেবল মাত্র কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া তুমি স্বদেশের উপকার করিতে চেষ্টা করিতে পার, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় না। তোমার হৃদয়হীন কাজগুলো বিদেশী বীজের মত স্বদেশের জমিতে ভাল করিয়া অঙ্কুরিত হইতে পারে না। তেমনি স্বকালের যে কেবল দোষই দেখে কোন গুণ দেখিতে পায় না, সে চেষ্টা করিলেও স্বকালের কাজ ভাল করিয়া করিতে পারে না। এক হিসাবে সে নাই বলিলেও হয়; সে জন্মায় নাই; সে অতীতকালে জন্মিয়াছে, সে অতীতকালে বাস করিতেছে; এ কালের জন সংখ্যার মধ্যে তাহাকে ধরা যায় না। ঠাকুরদাদা মশায়, তুমি যে তোমাদের কালকে ভালবাস এবং ভাল বল, সে তোমার একটা গুণের মধ্যে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে তোমাদের কালের কর্ত্তব্য তুমি করিয়াছ। তুমি তোমার বাপ মাকে ভক্তি করিয়াছ, তোমার পাড়াপ্রতিবেশীদের বিপদে আপদে সাহায্য করিয়াছ, শাস্ত্রমতে ধর্ম্মকর্ম্ম করিয়াছ, দান ধ্যান করিয়াছ, হৃদয়ের পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছ। যে দিন আমরা আমাদের কর্ত্তব্য কাজ করি, সে দিনের সূর্য্যালোক আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর বলিয়া বোধ হয়, সে দিনের সুখস্মৃতি বহুকাল ধরিয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।

সে কালের কাজ তোমরা শেষ করিয়াছ অসম্পূর্ণ রাখ নাই, সেই জন্য আজ এই বৃদ্ধ বয়সে, অবসরের দিনে সে কালের স্মৃতি এমন মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া একালের প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছ কেন! ক্রমাগতই একালের নিন্দা করিয়া একালের কাছ হইতে আমাদের হৃদয় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিতেছ কেন? আমাদের জন্মভূমি এবং আমাদের জন্মকাল এই দুয়ের উপরেই আমাদের অনুরাগ অটল থাকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

গঙ্গোত্রীর সহিত গঙ্গার অবিচ্ছিন্ন সহস্রধারে যোগ রক্ষা হইতেছে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া গঙ্গা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পিছু হঠিয়া গঙ্গোত্রীর উপরে আর উঠিতে পারে না। তেমনি তোমাদের কাল ভালই হউক আর মন্দই হউক্ আমরা কোনমতেই ঠিক সে জায়গায় যাইতে পারিব না। এটা যদি নিশ্চয় হয় তবে সাধ্যাতীতের জন্য নিষ্ফল বিলাপ পরিতাপ না করিয়া যে অবস্থায় জন্মিয়াছি তাহারই সহিত বনিবনাও করিয়া লওয়া ভাল ইহার ব্যাঘাত যে করে সে অনেক অমঙ্গল সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমানের প্রতি অরুচি ইহা প্রায়ই বর্ত্তমানের দোষে হয় না, আমাদের নিজের অসম্পূর্ণতা বশতঃ হয়, আমাদের হৃদয়ের গঠনের দোষে হয়। বর্ত্তমানই আমাদের বাসস্থান এবং কার্য্যক্ষেত্র। কার্য্যক্ষেত্রের প্রতি যাহার অনুরাগ নাই সে ফাঁকি দিতে চায়। যথার্থ কৃষক আপনার চাষের জমিটুকুকে প্রাণের মত ভালবাসে, সেই জমিতে সে শস্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম বপন করে; আর যে কৃষক কাজ করিতে চায় না ফাঁকি দিতে চায়, নিজের মাঠে পা দিলে তাহার পায়ে যেন কাঁটা ফুটিতে থাকে, সে কেবলই খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বলে আমার জমির এ দোষ সে দোষ, আমার জমিতে কাঁকর, আমার জমিতে কাঁটাগাছ ইত্যাদি। নিজের ছাড়া আর সকলের জমি দেখিলেই তাহার চোখ জুড়াইয়া যায়।

সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইয়াই থাকে। সেই পরিবর্ত্তনের জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে। নহিলে আমাদের জীবনই নিষ্ফল। নহিলে, মিউজিয়মে প্রাচীন কালের জীবেরা যেমন করিয়া স্থিতি করিতেছে আমাদিগকেও ঠিক তেম্নি করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করিতে হইবে। পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে টুকু সার্থকতা আছে, যে টুকু গুণ আছে তাহা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কারণ সেইখান হইতে রসাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে বাড়িতে হইবে, আর কোন গতি নাই। যদি আমরা সত্যই জলে পড়িয়া থাকি তবে সেখানে ডাঙ্গার মত চলিতে চেষ্টা করা বৃথা, সাঁতার দিতে হইবে।

অতএব, তুমি যে বলিতেছ, আমরা আজকাল গুরুজনকে যথেষ্ট মান্য করি না সেটা মানিয়া লওয়া যাক্, তার পরে এই পরিবর্ত্তনের ভিতরকার কথাটা একবার দেখিতে চেষ্টা করা যাক্। এ কথাটা ঠিক নহে যে, ভক্তিটা সময়ের প্রভাবে মানুষের

হৃদয় হইতে একেবারে চলিয়া গিয়াছে—তবে কি না, ভক্তিস্রোতের মুখ একদিক হইতে অন্য দিকে গেছে এ কথা সম্ভব হইতে পারে বটে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে ব্যক্তিগত ভাবের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশী ছিল। ভক্তি বল ভালবাসা বল একটা ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারিত না। একজন মূর্ত্তিমান রাজা না থাকিলে আমাদের রাজভক্তি থাকিতে পারিত না—কিন্তু শুদ্ধমাত্র রাজ্যতন্ত্রের প্রতি ভক্তি সে য়ুরোপীয় জাতিদের মধ্যেই দেখা যায়। তখন সত্য ও জ্ঞান, গুরু নামক এক জন মনুষ্যের আকার ধারণ করিয়া থাকিত। তখন আমরা রাজার জন্য মরিতাম, ব্যক্তিবিশেষের জন্য প্রাণ দিতাম—কিন্তু য়ুরোপীয়েরা কেবল মাত্র একটা ভাবের জন্য একটা জ্ঞানের জন্য মরিতে পারে। তাহারা আফ্রিকার মরুভূমিতে, মেরুপ্রদেশের তুষার গর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া আসিতেছে। কাহার জন্য? কোন মানুষের জন্য নহে। বৃহৎভাবের জন্য, জ্ঞানের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে য়ুরোপে মানুষের ভক্তি অনুরাগ জ্ঞানে ভাবে বিস্তৃত হইতেছে সুতরাং ব্যক্তিবিশেষের ভাগে কিছু কিছু কম পড়িতেছেই। সেই য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে ব্যক্তিবিশেষদের চারিদিক হইতে আমাদের শিকড়ের পাক প্রতিদিন যেন অল্পে অল্পে খুলিয়া আসিতেছে। এখন মতের অনুরোধে অনেকে পিতামাতাকে ত্যাগ করিতেছেন, এখন প্রত্যক্ষ বাস্তুভিটাটুকু ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষ স্বদেশের প্রতি অনেকের প্রেম প্রসারিত হইতেছে, এবং সুদূর উদ্দেশ্যের জন্য অনেকে জীবন যাপন করিতে অগ্রসর হইতেছেন। এরূপ ভাব যে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহার কাজ চলিতেছে, ইহার নানা লক্ষণ অল্পে অল্পে প্রকাশ পাইতেছে। ইহার ভাল মন্দ দুইই আছে। সে কথা সকল অবস্থা সম্বন্ধেই খাটে। তবে, যখন এই পরিবর্ত্তন একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তখন ইহার মধ্যে যে ভালটুকু আছে সেটা যদি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি, সেই ভালটুকুর উপর যদি অনুরাগ বদ্ধ করিতে পারি, তবে সেই ভালটুকু শীঘ্র শীঘ্র স্ফূর্ত্তি পাইয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে, মন্দটা ম্লান হইয়া যায়। নহিলে, সকল জিনিষের যেমন দস্তর আছে, মন্দটাই আগেভাগে খুব কণ্টকিত হইয়া সকলের চোখে পড়ে, ভালটা অনেক বিলম্বে গা-ঝাড়া দিয়া উঠে।

আমার কথাত আমি বলিলাম এখন তোমার কথা তুমি বল। তুমি কালেজে পড় নাই বলিয়া কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। কারণ, তোমারও লেখাতে বিলক্ষণ কালেজের গন্ধ ছাড়ে। সেটা সময়ের প্রভাব। ঘ্রাণে অর্দ্ধ ভোজন হয় সেটা মিথ্যাকথা নয়। অতএব এখনকার সমাজে বসিয়া তুমি যে নিশ্বাস লইতেছ ও নস্য লইতেছ, তাহাতেই কালেজের আর্দ্ধেক বিদ্যা তোমার নাকে সেঁধোইতেছে। নাক বন্ধ করিতে পারিতেছ না, কেবল নাক তুলিয়াই আছ। যেন পেঁয়াজ রশুনের ক্ষেতের মধ্যে বাস করিতেছ, এবং তোমার নাতিরাই তাহার একেকটি হৃষ্টপুষ্ট উৎপন্ন দ্রব্য। কিন্তু ইহা জানিও,

এ গন্ধ ধুইলে যাইবে না মাজিলে যাইবে না, নাতিগুলোকে একেবারে সমূলে উৎপাটন করিতে পার ত যায়। কিন্তু এ ত আর তোমার পাকা চুল নয়, এ রক্তবীজের ঝাড়!

সেবক
শ্রীনবীনকিশোর শর্ম্মণঃ।

আলোক ও উত্তাপ।

(পত্রের উত্তর)

জ্যৈষ্ঠমাসের বালকে প্রকাশিত সূর্য্যকিরণের ঢেউ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের একটি পাঠিকার মনে দুই একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। সন্দেহ দূর করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে একটি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি বলেন যে যখন সূর্য্যকিরণ ঈথরের ঢেউ ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং যখন ঈথর সকল স্থানেই উপস্থিত এবং সকল বস্তুর ভিতর দিয়া ইহার গমনাগমন তবে আমরা রাত্রিকালে সূর্য্যালোক পাই না কেন এবং দিনেরবেলায় জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলেই বা কেন অন্ধকার হয়।

বলা বাহুল্য যে পত্রখানি পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইয়াছি। যাঁহাদের জন্য "বালক" লিখিত হয় তাঁহারা যে মনোযোগের সহিত ইহা পাঠ করেন এবং বালকের উদ্দেশ্য যে কিয়ৎ পরিমাণেও সফল হইবার সম্ভাবনা আছে এই পত্র তাহার পরিচয় দিতেছে। এই নিমিত্ত ইহা আমাদের আদরণীয় এবং আমরা আহ্লাদের সহিত আমাদের পাঠিকার সন্দেহ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলাম। তিনি যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন অল্পের মধ্যে তাহার উত্তর দেওয়া যাইতে পারে বটে কিন্তু আলোক সম্বন্ধে দুই একটি কথা যাহা বিশেষ করিয়া বলা পূর্ব্বে আমরা প্রয়োজন মনে করি নাই, সংক্ষেপে তাহার উত্থাপনের এই উত্তম অবসর।

আলোক—সূর্য্যেরই হউক বা অন্য কোন জলন্ত বস্তুরই হউক—ঈথরের ঢেউ রূপে একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হয়। সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিবার এবং আমাদের চক্ষে পৌঁছিবার মধ্যে আলোক ঈথরের ঢেউ আকারে অবস্থিতি করে। কিন্তু আলোক কি? কি গুণের প্রভাবে সূর্য্য কিম্বা অন্য একটি জলন্ত বস্তু আলোকের আধার হয়? কি গুণের প্রভাবে একটি জলন্ত বস্তু ঈথরকে তরঙ্গিত করিতে পারে এবং অপরাপর বস্তু যাহা অন্ধকারে দেখা যায় না তাহারা করিতে পারে না? অন্ধকার রাত্রিতে একটি লোহার গোলা দেখা যায় না। কিন্তু সকলেই জানেন যে উত্তাপ দিতে দিতে ইহা ক্রমে

রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হয়। এই গোলক পূর্ব্বে অন্ধকারে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য ছিল, উত্তাপ দিতে দিতে ইহাতে কি পরিবর্ত্তন হইল যে ইহা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া চক্ষুর গোচর হইল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথম জানা আবশ্যক যে পদার্থ সমুদায় কি প্রকারে গঠিত। নানা প্রমাণের দ্বারা পণ্ডিতেরা জানিয়াছেন যে, পদার্থ সকল ছাড়া ছাড়া কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কণার সমষ্টি। সেই কণাগুলি আকর্ষণের নিয়মে কাছাকাছি দল বাঁধিয়া আছে বটে কিন্তু একেবারেই গায়ে গায়ে লাগিয়া নাই। তাহাদের মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে। এই কণাগুলি এত ছোট যে ইহাদিগকে চোখে দেখিতে পাই না, কিন্তু যখন অনেকগুলি একত্রে মিলিয়া থাকে তখনই আমরা তাহাদিগকে বস্তুবিশেষ বলিয়া দেখিতে পাই। এই কণাকে অণু বলিয়া থাকি। আবার এই অণুগুলিকে উত্তাপের দ্বারা ভাগ করিয়া ফেলিলে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অণু পাওয়া যায় তাহাকে আর কিছুতেই ভাগ করা যায় না। তাহাকে আমরা পরমাণু বলি। এক্ষণে জানিবার চেষ্টা করা যাউক এই সমস্ত অণু ও পরমাণু কি ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ইহারা কি স্থির অথবা গতিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা অনেক প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে পদার্থের অণু ও পরমাণু স্থির নহে, তাহারা গতিবিশিষ্ট। অতি দ্রুতগতিতে ইহারা বিকম্পিত হইতেছে। অণুরাশির বিকম্পন গতিই পদার্থের উত্তাপের কারণ। কোন বস্তুই একেবারে উত্তাপশূন্য নহে, উত্তাপ সংযোগে পদার্থের অণু-বিকম্পন ক্রমেই বাড়িতে থাকে অর্থাৎ তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেগে ও অধিক স্থান জুড়িয়া দুলিতে থাকে। অণু-বিকম্পণ যতই বাড়িতে থাকে ততই তাহারা উষ্ণ ও উষ্ণতর হয়।

মনে কর একটি লোহার গোলা তোমার শরীর অপেক্ষা ঠাণ্ডাও নহে গরমও নহে, অর্থাৎ গোলার অণু যে স্থান জুড়িয়া এবং যে বেগে দোলে তোমার শরীরের অণু ঠিক ততটুকু স্থান জুড়িয়া এবং সেই বেগে দুলিতে অর্থাৎ বিকম্পিত হইতে থাকে। এক্ষণে যদি উত্তাপ প্রদান করিয়া এই গোলাটিকে পূর্ব্বাপেক্ষা গরম করিয়া ইহার নিকট তোমার হাত লইয়া যাও তবে দেখিবে যে তোমার হাতে তাপ লাগিতেছে। তুমি ত গোলা স্পর্শ কর নাই, তবে তোমার হাতে তাপ লাগে কেন? বলা হইয়াছে ঈথর সর্ব্বত্র এবং সকল পদার্থের ভিতর বর্ত্তমান। উত্তাপ দিতে দিতে গোলার অণু-বিকম্পন যত বাড়িতে থাকে ঈথর-সাগরে ততই প্রবল ও প্রবলতর তরঙ্গ উঠিতে থাকে। এই তরঙ্গমালা চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। এবং নিকটে যদি কোন শীতল বস্তু থাকে তবে ঈথর তাহার মধ্যস্থিত অণু-গুলিকে আপনার কিয়দংশ গতি দিয়া তাহাদের বিকম্পন বাড়াইয়া তোলে, অর্থাৎ সেই শীতল বস্তু ক্রমে উষ্ণ হইয়া উঠে। যে-কোন বস্তু থাকিলেই যে এরূপ হইবে এমত নহে। এমন অনেক বস্তু আছে যাহাদের অণুগুলি ঈথরের গতি গ্রহণ না করিয়া অবাধে নিজের মধ্যদিয়া যাইতে দেয়। যাহাহউক মনুষ্যহস্ত এরূপ বস্তু নহে, কাজেই উষ্ণ গোলা সম্মুখে ধরাতে তাহার অণু বিকম্পন বাড়ে ও আমাদের স্পর্শ-

স্নায়ুর সাহায্যে হাতে তাপ অনুভব করি। উত্তাপ দিতে দিতে গোলাটি কেন রক্তবর্ণ হইয়া দৃষ্টির গোচর হয় তাহার কারণ বলিতেছি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উত্তাপ দিলে পদার্থের পূর্ব্বতন কম্পনগুলি বাড়িয়া উঠে। কিন্তু কেবল যে তাহাই হয় এমন নহে, পূর্ব্বতন কম্পন বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ও দ্রুততর কম্পনের উৎপত্তি হয়। নূতন কম্পনগুলি দ্রুততর বলিয়া এই বুঝাইতে চাই যে পূর্ব্বতন কম্পন অপেক্ষা ইহারা অল্প সময়ে সম্পাদিত হয়। উত্তাপ দিতে দিতে যখন একটি বিশেষ মাত্রায় দ্রুত কম্পন উৎপন্ন হয় তখন গোলা রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। এই কম্পনজনিত ঈথরতরঙ্গ যখন আমাদের চক্ষের পশ্চাতে যে দৃষ্টি-স্নায়ু জাল আছে তাহা উত্তেজিত করে তখন আমরা লালবর্ণ দেখিতে পাই। উত্তাপ দিতে দিতে নূতন নূতন দ্রুততর কম্পন উৎপন্ন হইতে থাকে এবং ক্রমে পীত হরিত নীল বায়লেট্ প্রভৃতি নূতন কিরণ জন্মিতে থাকে। এক্ষণে তবে দেখিলাম যে আলোক ও উত্তাপ উভয়েই ঈথর-তরঙ্গাকারে এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে যায়। নদীর স্রোতের মধ্যে যদি একখানা কাপড়ের ব্যবধান দেওয়া যায় তবে নদীর ঢেউয়ের কতক অংশ সেই কাপড়ের ব্যাঘাত পাইয়া ফিরিয়া আসে, কতক অংশ সেই কাপড়ের মধ্যে শোষিত হইয়া তাহাকে ভিজাইয়া তোলে, এবং কতক অংশ সেই কাপড় ভেদ করিয়া যায়। তেমনি উত্তাপ ও আলোকের ঢেউ কোন বস্তুতে আঘাত করিবামাত্র প্রায়ই তিনভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। যেদিক্ হইতে ঢেউ আসিতেছিল আঘাত পাইবামাত্র কতকগুলি ঢেউ সেই দিকে ফিরিয়া যায়; এই ঢেউগুলি প্রতিফলিত হয় বলা গিয়া থাকে। যে ঢেউগুলি বস্তুর ভিতরে প্রবেশ করে (স্মরণ থাকিতে পারে সকল বস্তুর ভিতরেই ঈথর আছে) তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ঐ বস্তুর অণু-বিকম্পন বাড়াইয়া উহাকে উষ্ণ করিয়া তোলে (এই তরঙ্গগুলি শোষিত হয় বলা যায়) এবং অন্যগুলি বাহির হইয়া যায়। বায়ুর ন্যায় এমন অনেক বস্তু আছে যাহার উপর আঘাত করিলে অধিকাংশ তরঙ্গ বাহির হইয়া যায়, অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয় এবং প্রায় কিছুই শোষিত হয় না; উজ্জ্বল ধাতুতে আঘাত করিলে অধিকাংশ তরঙ্গ প্রতিফলিত হয় অল্পমাত্র শোষিত হয়, কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যায় না। দরজা জানালার উপর আঘাত করিলে বেশির ভাগ তরঙ্গ শোষিত হয় অল্পমাত্র প্রতিফলিত হয় কিন্তু কিছুই বাহির হইয়া যাইতে পারে না। আবার এমন অনেক বস্তু আছে যাহা উত্তাপ তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে আলোক তরঙ্গ গ্রহণ করিতে পারে না আবার কোন বস্তু আলোক তরঙ্গ শোষণ করে এবং উত্তাপ তরঙ্গ অবিরোধে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে দেয়। একই বস্তু আবার ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গের কোনটিকে বা শোষণ করে, কোনটিকে বা ছাড়িয়া দেয়। একখানি লালবর্ণের কাঁচ কেবল লালবর্ণের তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়, একখানি নীলবর্ণ কাঁচ কেবল নীল ঢেউগুলি ছাড়িয়া দেয়, অপর গুলি শোষণ করিয়া নিজের উত্তাপ বৃদ্ধি করে। আবার যেরূপ লালবর্ণের আলোক আছে সেইরূপ নানা

"বর্ণেয়" উত্তাপতরঙ্গও আছে। একখানি শুভ্র কাঁচ ফলক সূর্য্যের উত্তাপতরঙ্গ প্রায় সমস্ত ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু জলন্ত অঙ্গারের উত্তাপ এবং পৃথিবী যে উত্তাপ বিকীরণ করে সে সমস্ত শোষণ করিয়া লয়। উনানের সম্মুখে বসিলে গাত্রে তাপ লাগিবে কিন্তু একটি কাঁচ-ফলকের ব্যবধান দিয়া বসিয়া দেখিও তাপ লাগিবে না। অথচ কাচের মধ্য-দিয়া রৌদ্র-তাপ আসে। আমাদের পাঠিকা বোধ করি এখন বুঝিয়া থাকিবেন যে দিনের বেলা জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিলে কেন ঘর অন্ধকার হয়। দেয়াল জানালা প্রভৃতি দ্রব্য ঈথরের গতি কাড়িয়া লয়, ঈথর-তরঙ্গকে আপনাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দেয় না। জানালাবদ্ধ না করিয়া যদি সার্সি বন্ধ করিয়া দাও তবে ঘরে আলোক দেখিবে, কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কাঁচ আলোক-তরঙ্গ ছাড়িয়া দেয়। এখন আর একটি কথা বলি, রাত্রে কেন সূর্য্যালোক পাই না? আমাদের পৃথিবী গোল, এক সময়ে ইহার এক অর্দ্ধে সূর্য্যকিরণ আঘাত করিতে পারে, অপরার্দ্ধের কোন স্থলে পৌছিতে হইলে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু পৃথিবী স্বচ্ছ নহে অর্থাৎ আলোক তরঙ্গ অবিরোধে ইহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। যদি পৃথিবী স্বচ্ছ উপাদানেও নির্ম্মিত হইত তাহা হইলেও ইহা ফুঁড়িয়া আলোকতরঙ্গ যাইতে পারিত কি না সন্দেহ। এক ফুট জল ভেদ করিয়া আলোক-তরঙ্গ অনায়াসে বাহির হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু ২০ ফুট জলের ভিতর দিয়া আলোক পাঠাইলে দেখিবে যে অর্দ্ধেক আলো শোষিত হইয়াছে। পৃথিবী এত বৃহৎ যে কাঁচের কিম্বা জলের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থে নির্ম্মিত হইলেও হয়ত আলোক-তরঙ্গকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দিত না।

শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একটি কথা বলিব। যাহা লিখিয়াছি ইহা যে সমস্তই আমাদের পাঠিকার সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত প্রয়োজন হইবে এমত নহে। সুবিধা পাইয়া আমি বিজ্ঞানের দু একটি সরল সত্য পাঠকের সম্মুখে ধরিয়াছি। ইহাতে প্রবন্ধের কলেবর ও আমার পরিশ্রম উভয়ই বাড়িয়া গিয়াছে। ইহা পড়িয়া পাঠক পাঠিকাদের যদি কিছু নূতন শিক্ষা ও জ্ঞানতৃষা বৃদ্ধি হয় তবে শ্রম সার্থক মনে করিব। তাহা যদি না হয় পাঠকপাঠিকাদের কোন বিশেষ লোক্‌সান্‌ নাই, লোক্‌সান্‌ আমারই!

গান অভ্যাস।

এবার গানে একটি নূতন সঙ্কেত ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। গানের যে অংশটুকু দুই বিন্দুযুক্ত দুই দাঁড়ির মধ্যে (॥: :॥) লিখিত হইবে তাহা দুইবার করিয়া গাইতে হইবে। একজন পাঠক আমাদিগকে "আজি শুভদিনে" এই

ব্রহ্মসঙ্গীতটির স্বরলিপি করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আনন্দের সহিত তাঁহার অনুরোধ পালন করিলাম।

"আজি শুভদিনে" এই গানটীর তাল ফেরতা অর্থাৎ ইহাতে বরাবর একই তাল রক্ষা করা হয় নাই। ইহার কিয়দংশ একতালা কিয়দংশ কাওয়ালি।

একতালা তালে চারিটী করিয়া তাল থাকে এবং প্রত্যেক তাল তিনটী করিয়া মাত্রা অধিকার করিয়া থাকে।

"ভাসিয়ে দে তরী" নামক গান গতবারে স্থানাভাব বশতঃ যাইতে পারে নাই, এই জন্য সেই গানটি এবারে প্রথমে দেওয়া গেল।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

ভাসিয়ে দে তরী তবে নীল সাগর পরি।
বহিছে মৃদুল বায়, নাচিছে মৃদু লহরী।
ডুবেছে রবির কায়া, আধ আলো আধ ছায়া,
আমরা দুজনে মিলি যাই চল ধীরি ধীরি।
একটি তারার দীপ যেন কনকের টিপ্
দূর শৈল ভুরুখানি রয়েছে উজল করি।
নাহি সাড়া নাহি শব্দ মন্ত্রে যেন সব স্তব্ধ
দুজনে প্রাণের কথা কহিব পরাণ ভরি।

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

```
 ০            ১             ২             ৩             ০
রে – – – ম – । রে – – সা – – । রে – – – – – । সা – – সা – – ॥ রে – – ম – – ।
ভা      সিয়ে  দে     ত      রী            ত     বে      নী
১              ২             ৩                   ০               ১
ম – – ম – গা — । ম – পা – ম – গা । রে — গা — রে — সা ॥ রে – – রে – – । ম
ল    সা        গ     র      *প      রি        ব     হি         ছে
        ২            ৩              ০              ১
ম – গ — । ম – – পা – – । ধা – – নি — ধা — ॥ পা – – ধা — পা — । ম – – ধা – – ।
মৃ       দু     ল       বায়্              না     চি        ছে    মৃ
২             ৩                    ০             ১
ধা — পা — ম — গা — । রে — গা — রে — সা — ॥ রে – – – ম — । রে – – সা – – ।
দু       ল          হ      রি        ভা      সিয়ে    দে    ত
২          ৩            ০              ১            ২
রে – – – – । সা – – সা – – ॥ রে – – ম – – । ম – – ম – গা — । ম – পা – ম –
রী         ত     বে      নী              ল    সা        গ     র
```

৩ ০ ১ ২
গা—। রে—গা—রে—সা—॥॥ঃ ম——পা——। নী——র্সা——। র্রে———র্সা—।
প রি ডু বে ছে র বি র
৩ ০ ১ ২
নী——র্সা——॥ নী——র্সা——। র্রে—র্ম——র্রে—। র্সা—র্রে—র্সা—নি—।
কা য়া আ ধো আ লো আ ধো
৩ ০ ১ ২ ৩
ধা—নি০ধা০পা——ঃ॥॥ ম——রে——। ম——ম—গা। ম——পা——। ধা——
ছা ·য়া আ ম রা দু জ নে মি
০ ১ ২ ৩
নি—ধা—॥ পা——ধা—পা—। ম——ধা——। ধা—পা—ম—গা—। রে—গা—
লে যা ই চ ল ধী রি ধী
০ ১ ২ ৩
রে—সা—॥ রে———ম—। রে——সা——। রে———সা—। নী——সা——॥
রি এ ক টি তা রা র দীপ্
০ ১ ২ ৩
রে——ম —। ম——গা০ম০পা—। পা—ম—ম—গা—। রে—গা—সা——॥
যে ন ক ণ কে র টীপ্
০ ১ ২ ৩ ০
রে——ম——। ম——ম—গা—। ম——পা——। ধা——নি—ধা—॥ পা——
দূ র শৈ ল ভু রু থা নি র
১ ২ ৩ ০
ধা—পা—। ম——ধা——। ধা—পা—ম—গা—। রে—গা—সা——॥॥ঃ ম——
য়ে ছে উ জ ল ক রি না
১ ২ ৩ ০
পা——। নী——র্সা——। র্রে———র্সা—। নী——র্সা——॥ নী——র্সা——।
হি সা ড়া না হি শ ব্দ ম ন্ত্রে
১ ২ ৩ ০ ১
র্রে—র্ম——র্রে—। র্সা—র্রে—র্সা—নি—। ধা——পা——ঃ॥॥ ম——রে——। ম——
যে ন স ব স্ত ব্ধ দু জ নে
২ ৩ ০ ১
ম—গা—। ম——পা——। ধা——নি—ধা॥ পা——ধা—পা—। ম——ধা——।
প্রা ণে র ক থা ক হি ব প
২ ৩
ধা—পা—ম—গা—। রে—গা—রে—সা—॥
রা ণ ভ রি

রাগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

আজি শুভদিনে, পিতার ভবনে,
অমৃত সদনে চল যাই
চল চল চল ভাই।
না জানি সেথা কত সুখ মিলিবে,
আনন্দের নিকেতনে,
চল চল চল ভাই।
মহোৎসবে ত্রিভুবন মাতিল,
কি আনন্দ উথলিল,
চল চল চল ভাই।
দেবলোকে উঠিয়াছে জয় গান,
গাহ সবে একতানে,
বল সবে জয় জয়॥

রাগিণী কর্ণাটী তাল—ফেরতা।

একতালা।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২
সা—রে—সা—সা—নি—ধা। ধা—নি—ধা—ধা—পা—ম—॥ ম—পা—ধা—পা—ধা—
আ জি শু ভ দি নে পি তা র ভ ব নে অ মৃ ত স দ
৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
সা—। ম——পা—ম———॥ঃ ম——সা—রে——সা—। ম—গা—রে—সা———ঃ॥
নে চ ল যাই চ ল চ ল চ ল ভাই
১ ২ ৩ ৪ ১ ২
সা—রে—সা—সা—নি—ধা—। ধা—নি—ধা—ধা—পা—ম—॥ ম—পা—ধা—পা—
আ জি শু ভ দি নে .পি তা র ভ ব নে অ মৃ ত স।

কাওয়ালি।

৩ ৪ ১ ২
ধা—সা—। ম——পা—ম———॥ঃ ম—ম—ম——। ম——ম——।
দ নে চ ল যাই না জা নি সে থা
৩ ০ ১ ২
গা—ম—পা—ম—। গা—রে—সা——ঃ॥ ম——গা——। রে——সা——।
ক ত সু খ মি লি বে আ নন্ দে র

একতালা।

৩ ০ ১ ২ ৩
নি— —ধা— —। পা— —ম ॥ ॥ঃ ম— —সা—রে— —সা—। ম—গা—রে—
নি কে ত নে চ ল চ ল চ ল

৪ ১ ২ ৩ ৪
সা— — —ঃ॥॥ সা—রে—সা—সা—নি—ধা—। ধা—নি—ধা—ধা—পা—ম—॥
ভাই আ জি শু ভ দি নে পি তা র ভ ব নে

কাওয়ালি।

১ ২ ৩ ৪ ১
ম—পা—ধা—পা—ধা—সা—। ম— —পা—ম— — —॥ ॥ঃ ম— — ম— — —।
অ মৃ ত স দ নে চ ল যাই ম হোৎ

২ ৩ ০ ১
ম— —ম— — —। গা—ম—পা—ম—। গা—রে—সা— — ঃ॥ ॥ ম— — গা — —।
স বে ত্রি ভু ব ন মা তি ল কি আ

একতালা।

২ ৩ ০ ১ ২
রে— —সা— —। নি— —ধা— —। পা— —ম— —॥ ॥ঃ ম— —সা—রে— —সা—।
নন্ দ উ থ লি ল চ ল চ ল

৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
ম—গা—রে—সা— — —ঃ॥॥ সা—রে—সা—সা—নি—ধা—। ধা—নি—ধা—ধা—
চ ল ভাই আ জি শু ভ দি নে পি তা র ভ

১ ২ ৩ ৪
পা—ম—॥ ম—পা—ধা—পা—ধা—সা—। ম— —পা—ম— — —॥ ॥ঃ
ব নে অ মৃ ত স দ নে চ ল যাই

কাওয়ালি।

১ ২ ৩ ০
ম— —ম— — —। ম— —ম— —। গা—ম—পা—ম—। গা—রে—সা— — ঃ॥ ॥
দে ব লো কে উ ঠি য়া ছে জ য় গান্

১ ২ ৩ ০
ম— —গা— —। রে— —সা— —। নি— —ধা— —। পা— —ম— —॥ ॥ঃ
গা হ স বে এ ক তান্

একতালা।

১ ২ ৩ ৪ ১ ২
ম— —সা—রে— —সা—। ম—গা—রে—সা— — —ঃ॥॥ সা—রে—সা—সা—
ব ল স বে জ য় জয় আ জি শু ভ

৩ ৪ ১ ২
নি—ধা—। ধা—নি—ধা—ধা—পা—ম—॥ ম্ব—পা—ধা—পা—ধা—র্সা—।
দি নে পি তা র ভ ব নে অ মৃ ত স দ নে
৩ ৪
ম——পা—ম———॥
চ ল যাই

হেঁয়ালি নাট্য।

গতবারের হেঁয়ালি নাট্যের উত্তর অনেকেই অনুমান করিতে পারিয়াছেন। ইহার উত্তর হাঁসপাতাল। উক্ত নাট্যে হাঁস, পা, তাল, এবং হাঁসপাতাল শব্দ মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হইয়াছে। এবারে আরেকটি দেওয়া গেল। পাঠকেরা বলুন।—

প্রথম দৃশ্য।

বাড়ির সম্মুখে পথে বসিয়া পা ছড়াইয়া বনমালি পরমানন্দে সন্দেশ আহার করিতেছেন। বয়স ৭।

তিনকড়ির প্রবেশ। বয়স ১৫।

তিনকড়ি। (সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত করিয়া) কি হে বটকৃষ্ট বাবু, কি করচ?

(বনমালির নিরুত্তরে অবাক্ হইয়া থাকন্।)

তিনকড়ি। উত্তর দিচ্চনা যে! তোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়?

বনমালি। (সংক্ষেপে) না!

তিনকড়ি। অবিশ্যি বটকৃষ্ণ। যদি হয়! আচ্ছা, তোমার নাম কি বল!

বনমালি। আমার নাম বনমালি!

তিনকড়ি। (হাসিয়া উঠিয়া) ছেলেমানুষ, কিচ্ছু জান না। বনমালিও যা বটকৃষ্ণও তাই, একই! বনমালির মানে জান?

বন। না।

তিনকড়ি। বনমালি মানে বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণের মানে জান?

বন। না।

তিনকড়ি। বটকৃষ্ণর মানে বনমালি। আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখন আদর করেও ডাকে না বটকৃষ্ণ!

বনমালি। না।

তিনকড়ি। ছী ছি। আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, যোধোর বাবা যোধোকে বলে বটকৃষ্ণ,—তোমার বাবা তোমাকে কিছু বলে না। ছী ছি। (পার্শ্বে উপবেশন)

বনমালি। (সগর্ব্বে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।

তিনকড়ি। আচ্ছা ভুতুবাবু তোমার ডানহাত কোনটা বল দেখি!

বনমালি। (ডান হাত তুলিয়া) এইটে ডান হাত!

তিনকড়ি। আচ্ছা, তোমার বাঁ হাত কোন্‌টা বলদেখি!

বনমালি। (বামহাত তুলিয়া) এইটে!

তিনকড়ি। (খপ্‌ করিয়া পাত হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) আচ্ছা ভুতুবাবু এইটে কি বল দেখি!

(বনমালির শশব্যস্ত হইয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা)

তিনকড়ি। (সরোষে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) এতবড় ধেড়ে ছেলে হলি, এইটে কি জানিস্‌নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়। (তিনকড়ির মুখের মধ্যে সন্দেশের দ্রুত অন্তর্ধান)

বনমালি। (পৃষ্ঠে হাত দিয়া) ভ্যাঁ—।

তিনকড়ি। ছি ছি ভুতুবাবু, তোমার জ্ঞান হবে কবে বলদেখি? এইটে জাননা যে, পেটে খেলে পিঠে সয়?

(আরেকটা সন্দে... মুখের ভিতর পূরণ)

বনমালি। (দ্বিগুণ বেগে) ভ্যাঁ—।

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিটে সয়না? এই দেখনা কেন, পেটে খেলে (আরেকটা সন্দেশ খাইয়া) পিঠে সয় (বনমালির পৃষ্ঠে চপেটাঘাত)। সয় না?

বনমালি। (সরোদনে চীৎকার পূর্ব্বক) না ন্না ন্না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করিয়া) তা হবে! তোমার তাহলে সয় না দেখ্‌চি! যার যেমন ধাত! তবে থাক্‌, তবে আর কাজ নেই। তবে আজ এই স্থির হল কারো বা পেটে সমস্তই সয়, কারো বা পিঠে কিছুই সয় না! যেমন আমি আর তুমি।

(সহসা বনমালির পিতার প্রবেশ)

পিতা। কিরে ভুতু, কাঁদ্‌চিস কেন?

(পিতাকে দেখিয়া বনমালির দ্বিগুণ ক্রন্দন)

তিনকড়ি। (বনমালির পৃষ্ঠে হাতবুলাইয়া অতি কোমল স্বরে) বাবা জিগ্‌গেষ করুচেন, কথার উত্তর দাও!

বনমালি। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোন দোষ নেই—সন্দেশগুলি খেয়ে ভুতুবাবু ঠোঙ্গাটি নিয়ে খেলা করছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু কে মেরেচেরে?

বনমালি। (তিনকড়িকে দেখাইয়া) ও মেরেচে!

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খুব মেরেচি বটে! কার না রাগ হয় বলুন দেখি! ছেলেমানুষ খেলা করচে—খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙ্গাটা কেড়ে নেও কেন বাপু? আপনি থাক্‌লে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাক্‌লে তার দুখানা হাড় একত্তর রাখ্‌তেম না। যত সব ডানপিটে ছেলে এ পাড়ায় জুটেছে!

বনমালি। বাবা, ও আমার সন্দেশ—

তিনকড়ি। (নিবৃত্ত করিয়া) আরে, আরে, ও কথা আর বল্‌তে হবে না।

পিতা। কি কথা!

তিনকড়ি। আজ্ঞে কিছুই নয়। আমি ভুতুবাবুকে আনা দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা! সে কি আর বল্‌বার বিষয়!

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কি বাপু!

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিতা। ঠাকুরের [illegible]

তিনকড়ি। খুদিরাম মুখোপাধ্যায়!

পিতা। তুমি আমার পরমাত্মীয়। খুদিরাম যে আমার পিস্‌তুতো ভাই হয়।

(তিনকড়ির ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

পিতা। চল বাবা, বাড়িভিতর চল। জলখাবার খাবে। আজ পৌষপার্ব্বণ পিটে না খাইয়ে ছাড়ব না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে!

পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাক্‌বে। কাল মধ্যাহ্ন ভোজন করে বাড়ি যেয়ো!

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে!

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অন্তঃপুরে তিনকড়ি পিষ্টক আহারে প্রবৃত্ত।

তিন। (স্বগত) ডানহাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চল্‌চে ভাল।

ভুতুর মা। (পাতে চারটে পিটে দিয়া) বাবা, চুপকরে বসে থাক্‌লে হবে না, এ চার খানাও খেতে হবে!

তিন। যে আজ্ঞে। (আহার)

BY H.C.HALDER

রেখাক্ষর বর্ণমালা।

অথ হল-বর্ণের সংখ্যা।

চৌত্রিশটি হল বর্ণ ; তা'র মধ্যে ছটি
কোন কাজ নাহি করে, বারো মাস ছুটি ॥
ছই ব'র এক ব তো কিছুই না করে,
অথচ অন্তস্থ বলি খ্যাত চরাচরে ॥
আছেন আরেক জন পালোয়ান মিঞা !
নাম খুব জাঁকালো—পিঠে-পালান ঞ ॥
পালানে হেলান্ দিয়া পাকাইয়া ল্যাজ,
ঝিমোয় রাত্তির দিন—এই তাঁর কাজ ॥
গেরদা ঠেসান দিয়া আলবোলা ফোঁকে।
ঢুলিয়া প'ড়েছে ঘাড় আফিমের ঝোঁকে ॥
কোন কাজ যদি তা'রে দেখিনু করিতে !
যত তাঁর কেরামত চৈতন্য-চরিতে ॥
ঞ আর অন্তস্থ ব—মিছে এক দায় !
পেনসান দিয়া দোঁহে করিনু বিদায় ॥
হল-কলেবর হ'তে ঝাড়ি গেল বিষ।
চৌত্রিশের ছুই গেল রহিল বত্রিশ ॥
ইতি হল বর্ণ সংখ্যা ॥

অথ বর্গ-বিবেক।

ৱবে-মাত্র পাঁচ বর্গ তোমাদের পুঁজি।
াটটি বরগ আমি পাইয়াছি খুঁজি ॥
্রত্যেক বরগে বর্ণ চারিটি করিয়া।
রি-আটে বত্রিশটি পাইনু ধরিয়া ॥
খগঘ কবর্গ—চবর্গ চছজঝ,
হে মিলি কচ-বর্গ, কথা-টি সমঝ' ॥
নঙ, টঠডঢ, নবর্গ টবর্গ।
-বর্গ দোঁহে খোঁজে দোঁহার সংসর্গ ॥
নবর্গের বাড়ি নাসা, টবর্গের মাথা।
কাছাকাছি বাস, তাই এক সঙ্গে গাঁথা ॥
তথদধ তবর্গ—পবর্গ পফবভ।
দোঁহে মিলি তপবর্গ, শিক্ষা এই লভ' ॥
ত-বর্গের বাড়ি দন্ত, পবর্গের ঠোঁট।
মুখ-দ্বারে বসি দোঁহে, সদা করে ঘোঁট ॥
র ল য হ—র-বর্গ, স বর্গ—স ষ শ ক্ষ
এ ছুটারে ভাল করি করা চাই লক্ষ ॥
রবর্গেরে বলি আমি "ওহে র ল য হ !
কে তোমরা চারি ভাই, সত্য করি কহ !
লোকে বলে হল-বর্ণ—কিন্তু তা' তো নয় !
ভিতরের কথা আমি জানি সমুদয় ॥
র তোমায় সে দিন দেখিনু একরত্তি !
ঋ-অ এই ছুই স্বরে লভিলে উৎপত্তি ॥
ল এসে'ছ ৯-অ হ'তে, জানি বিলক্ষণ।
ই-অ হ'তে য তোমার ইহ আগমন ॥
হ তুমি প'ড়েছ ধরা আজি মোর কাছে।
নিশ্বাস-বায়ুর পুত্র, ল্যাজ-টিও আছে ॥
প এক ফুঁয়ের জোরে ফ যেমন ফোঁকে।
অ তেমনি হ উগরে নিশ্বাসের ঝোঁকে ॥
থ থাকি ক'য়ের পাশে হইয়াছে ধন্য।
হ তুমি অ'য়ের পাশ ছাড়িলে কি জন্য ?
পাছে লোকে বলে "স্বর" এই না কারণ
মোর কাছে খাটিবে না ছল্ম আবরণ !
আমার পড়ুয়া সবে "অ-আ" নাহি বলে
"অ-হ আ-হা ই-হি" বলে তাহার বদলে।
"ই-হি" বলি হি-হি করি হাসে যদি মুহু,
বেত্রাঘাতে অমনি বলাই "উ-হু উ-হু" !

আনিয়াছি শিশুবোধ স্বচক্ষে নিরখ'।
হলবর্ণ-শিরোদেশে বসি আছে কথ ॥
অ-হ, আ-হা, স্বরশিরে কেমন মানায়!
হ তোমার, হেন দশা, কেন তবে হায়!
স্বরের মুকুট তুমি হল-পদ-তলে!
তা' চেয়ে মরণ ভাল দড়ি দিয়া গলে।"
বাম কাণে ইহা শুনি র-ল-য-হ চুপ!
ডা'ন কাণে লাগাইল কঠিণ কুলুপ ॥
না রাজি—না অরাজি—হইল নিমরাজি।
হল-স্বর দোঁহার রহিল মাঝামাঝি ॥
স্বর ঘরে জনম তবুও স্বর নহে।
অন্তস্থ, ও-গুলি সবে, পণ্ডিতেরা কহে ॥
অন্তস্থ, অন্তর্বর্ত্তী, কিনা মাঝামাঝি।
আধো দিবা,আধো নিশা,শোভে যেন সাঁঝি ॥
করিলে, কি হ'বে আর, বিবাদ-কলহ।
রবর্গে থাকুক্ গিয়া র-ল আর য-হ ॥
ইহা শুনি স ষ শ ক্ষ করি উঠে কোঁস্—
"মোরা চারি ভাই তবে কি করিনু দোষ!
আমাদের একটা দেখা'য়ে দেও বাড়ি।"
সবর্গের কোটা দিনু ইহাদেরে ছাড়ি ॥
উষ্মা ইহাদের নাম, শ্লেষ্মা বারো মাস।
স ষ গলা সাঁই সাঁই, ক্ষিও ক্ষিও কাশ ॥
র বর্গে সবর্গে, দেখি, দিব্য মিল-মিশ।
র্ র্ র্ দেয় ঘোর-পাক, স্ স্ স্ দেয় সিস ॥
রবর্গ সবর্গ দোঁহে মিলাইয়া তান,
র-স হ'য়ে গড়ায় জুড়ায় তার প্রাণ ॥
ক-চ, ন-ট, ত-প, র-স, বর্গ এই আট,
আজ্ঞাকারী হ'বে তব, এগোইলে পাঠ॥
ইতি বর্গ-বিবেক ॥

অথ বর্গ-রেখা ও বর্ণ-রেখা।

কচ-বর্গ-রেখা।

কচ-বর্গ দুই ভাই সম্মানের পাত্র।
রেখা সোজা,লেখা সোজা,দাঁড়ি কসি মাত্র।

কচ-বর্গের বর্ণ-রেখা

ক একটি সরু দাঁড়ি কিম্বা সরু কসি।
খ হয় লাঙ্গুলে যদি বাঁকায় বঁড়শী ॥

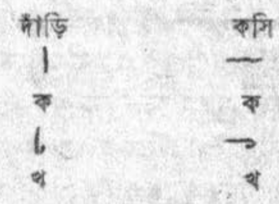

গ ঘ হ'বে, কখ যদি মোটা করি লেখ'
ক খ সরু, গঘ মোটা, ঠাহরিয়া দেখ ॥

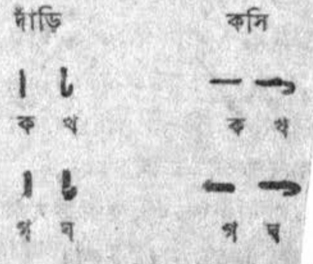

ক খ গ ঘ মূলে যদি পুঁটুলি পাকায়,
চ ছ জ ঝ হইয়া চ-বর্গে চলি-যায়।
ক-বর্গের যেই রীত, চবর্গেরও তাই।
চ-বর্গে পুঁটুলি আছে, কবর্গে তা' নাই॥

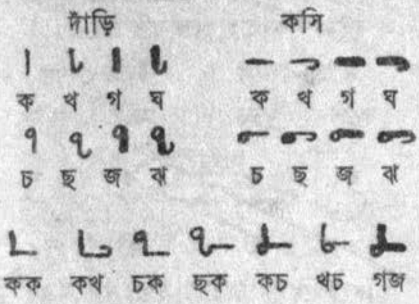

নট বর্গ-রেখা।

নট বর্গ দুই ভাই নটবর-বাঁকা
গো শৃঙ্গ মহিষ শৃঙ্গ চিত্র পটে আঁকা॥

নট বর্গের বর্ণ-রেখা

গো শৃঙ্গ মহিষ-শৃঙ্গ ন-বেচারা দন্ত্য।
মূর্দ্ধণ্য হইয়া যায় বাঁকে যদি অন্ত॥

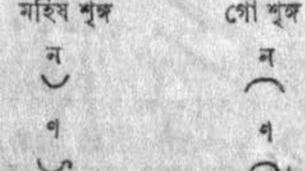

ন-ণ-দোঁহে ম-ঙ হয় হ'লে পরে মোটা।
ন-ণ সরু, দেখ চেয়ে, ম-ঙ গ্যাটা-গোটা॥

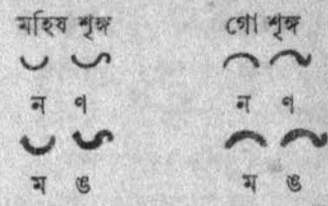

ন ণ ম ঙ মূলে যদি পাকায় পুঁটলি।
ট ঠ ড ঢ হইয়া টবর্গে পড়ে টলি॥
ন-বর্গের যেই রীত টবর্গের তাই।
টবর্গে পুঁটুলি আছে নবর্গে তা' নাই॥

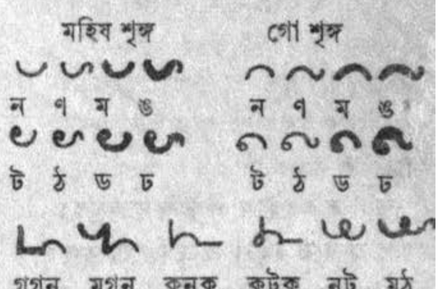

তপ বর্গ-রেখা

তপ বর্গ, তেড়া বাগে, চলে যেন স্থচি,
ছেঁড়া জুতা যখন সেলাই করে মুচি॥

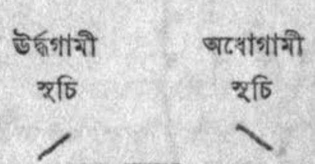

তপ-বর্গের বর্ণ-রেখা

ত একটি সরু স্থচ, উচ্চ নীচে টাকে।
থ বনিয়া-যায় তাহা, অন্ত যদি বাঁকে॥

নিম্নগামী ঊর্দ্ধগামী

সূচ সূচ

ত ত

থ থ

ত থ দোঁহে মোটাইয়া হ'য়ে যায় দ ধ।
নিজে তুমি দেখি শেখো, দ্বিজে কেন বধ॥

নিম্ন-গামী ঊর্দ্ধ-গামী

ত থ ত থ

দ ধ দ ধ

ত থ দ ধ হইলে পুঁটুলি-যুক্ত-মূল।
প ফ ব ভ হইয়া পবর্গে পায় কূল॥
তবর্গের যেই রীত, পবর্গেরও তাই।
পবর্গে পুঁটুলি আছে, তবর্গে তা নাই॥

নিম্নগামী। ঊর্দ্ধগামী

ত থ দ ধ ত থ দ ধ

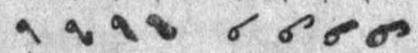

প ফ ব ভ প ফ ব ভ

তপন পতন বদন দমন ভবন তথন

রস-বর্গ-রেখা।

রস-বর্গ দুই ভাই তেড়া বেঁকা গাত্র।
কভু উচ্চে, কভু নীচে চলে অসি-দাত্র॥

অসি দাত্র অসি দাত্র

অধোগামী ঊর্দ্ধগামী

রস-বর্গের বর্ণ রেখা।

র দাত্র অথবা অসি, উচ্চে নীচে ঝাঁকে।
ল হইয়া লকলকে অস্ত যদি বাঁকে॥

নীচে কোপ উচ্চে কোপ

অসি দাত্র অসি দাত্র

র র র র

ল ল ল ল

র-ল দোঁহে মোটাইয়া হ'য়ে যায় য-হ।
র-ল সরু য-হ মোটা—সত্য কি না কহ'॥

নীচে কোপ উচ্চে কোপ

অসি দাত্র অসি দাত্র

র ল র ল র ল র ল

য হ য হ য হ য হ

র ল য হ মূলে যদি পুঁটুলি পাকায়,
স ষ শ ক্ষ হইয়া সবর্গে সরি যায়॥
র বর্গের যেই রীত সবর্গেরও তাই।
স বর্গে পুঁটুলি আছে, রবর্গে তা' নাই॥

নীচে কোপ উচ্চে কোপ

অসি দাত্র অসি দাত্র

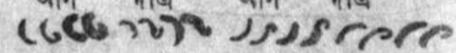

র ল য হ র ল য হ র ল য হ র ল য হ

স ষ শ ক্ষ স ষ শ ক্ষ স ষ শ ক্ষ স ষ শ ক্ষ

রস শশ লগন জলজ কলস করষ তরল

ইতি হলবর্ণ রেখাবলী॥

বোম্বাই সহর।

প্রথম ভাগ।

বোম্বাই নাম কোথা হইতে হইল? এ নামের উৎপত্তি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়।

নাম — ইউরোপীয়দের মধ্যে অনেকের মত এই যে পোর্টুগীজেরা বোম্বায়ের সুন্দর উপসাগর (Bon-bay) দেখিয়া এই দ্বীপের নামকরণ করে। কেহ কেহ বলেন যে মুম্বা দেবীর মন্দির হইতে এই নামের সৃষ্টি হইয়াছে। এই মন্দির অদ্যাপি নগরীর মধ্যভাগে বিদ্যমান। ইহা এক পুরাতন মন্দির। প্রবাদ এই যে ৪০০, ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠা হয়। ইহা প্রথমে ধোবিতলাও (যেখানে ধোপারা কাপড় কাচে) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল—শতাধিক বৎসর হইল স্থানান্তরিত হইয়াছে। দেবীর নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কুলীদের উপাস্য দেবতা 'মুম্বা' ব্রাহ্মণ হস্তে পড়িয়া 'মুম্বা' নাম ধারণ করিলেন। সে যাহা হউক, সকল জিনিসের 'কেন' বের করা সহজ নয় আর উহার আবিষ্কারও সকল সময়ে সন্তোষকর হয় না। ভারতের রাজধানীর নাম কলিকাতা কেন হইল তাহা কি তুমি বলিতে পার? সুন্দর-বন্দর বোম্বাই নামের অর্থ হয় তাহাই যথার্থ নাম বলা যাইতে পারে ও তাহা জানিয়াই অা-ততঃ আমাদের সন্তুষ্ট থাকা-উচিত।

ইতিহাস — বোম্বাই দ্বীপ ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে অথবা তৎসমীপবর্ত্তী কালে পোর্টুগীদের হস্তে পতিত হয়। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে নাবিকশ্রেষ্ঠ বাস্কো ডি গামা কালিকটে পদার্পণ করেন। যে ইউরোপীয় জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভাগ্যবলে উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে ভারতের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হইল তাহাদের প্রতাপ সেই অবধি ভারত-সাগরে ক্রমিকই বিস্তারিত হইতে চলিল। সর্ব্বপ্রথমে পোর্টুগীজদের লক্ষ্য বোম্বায়ের দক্ষিণ মালাবার তীরবর্ত্তী প্রদেশেই বদ্ধ ছিল; কালিকট, কানানোর, গোওয়া প্রভৃতি স্থানেই তাঁহারা উপনিবেশ পত্তন করেন। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে দুই চারি বৎসর পরে বোম্বাই পোর্টুগীজদের হস্তগত হয়। কিন্তু তাহাদের সমস্পর্দ্ধী আর এক ইউরোপীয় জাতি বাণিজ্যচ্ছলে ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইল। ষোড়শ শতাব্দীর অন্তে ইংরাজেরা এ দেশে প্রবেশ করে—আসিয়া অবধি তাহাদের লোভদৃষ্টি বোম্বায়ের উপরে নিপতিত হয়। দুই একবার বোম্বাই দখল করিবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই; অবশেষে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ-যৌতুক স্বরূপে বোম্বাই ইংরাজের হস্তাধীন হইল। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিষ ও পোর্টুগীজ রাজার মধ্যে যে বিবাহ সন্ধি সম্বন্ধ হয় তাহা হইতেই বোম্বায়ে ব্রিটিষ অধিকারের সূত্রপাত, যদিও এই দ্বীপ ইংরাজদের হাতে আসিতে আরো ৪, ৫ বৎ-

সর বিলম্ব লাগে। তখন বোম্বাই দ্বীপ এমন হতাদরের বস্তু ছিল যে ইংলণ্ডের রাজা ১০ পৌণ্ড বার্ষিক করের বিনিময়ে ইহা অকাতরে কোম্পানি বাহাদুরের করে সমর্পণ করিলেন।

সেকাল আর একাল

বোম্বায়ের সেকাল আর একাল কত তফাৎ! আকাশ পাতাল প্রভেদ। রাজা যে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া এই দ্বীপকে হস্তান্তর করিলেন তাহা আশ্চর্য্য নহে। যখন ইংরাজেরা প্রথম বোম্বাই অধিকার করিল তখন তাহা কি অকিঞ্চিৎকর বস্তু! কি সম্পত্তি তাহার করতলন্যস্ত হইল? একটী পাকাবাড়ী যাহা ভবিষ্যতে গবর্ণমেণ্ট হৌসে পরিণত হইল—তাহার চারিদিকে বাগান—দু চারিটি তোপ, নারিকেল বনের মধ্যে বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ঘর—কতকগুলি জেলের কুটীর ও প্রচুর পরিমাণে জীয়ন্ত ও পচা মাছ—এই যা ইংরাজদের ভোগে আসিয়া ছিল। তথাকার জনসংখ্যা পলাতক ও তস্কর মিলিয়া বড় জোর দশ হাজার। এইক্ষণে জন সংখ্যা প্রায় তাহার ১০ গুণ অধিক হইবে। আবহাওয়া মারাত্মক—তাহার কারণ স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের অভাব, যে বিজ্ঞান-প্রভাবে এখন তাহার আশ্চর্য্য রূপান্তর। অনেক কষ্টে ৩০০০০ টাকা বার্ষিক কর আদায় হইত। বোম্বায়ের ভূমি এমন সস্তা ছিল যে সমুদায় মালাবার নর ইজারার টাকায় এক্ষণে অর্দ্ধ কাটা ভূমিখণ্ড পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। াজদের অধীনে আসিয়া শীঘ্রই তাহার শ্রী ফিরিল। দুর্গ ও গৃহ নির্ম্মাণ, বন্দর স্থাপন, িজ্য ব্যবসায়ে উৎসাহবর্দ্ধন এই সকল কার্য্যানুষ্ঠানে ইংরাজ রাজ্যের সুফল ফলিতে গিল। ইংরাজ-রাজ্য ব্যবস্থার এক প্রধান গুণ এই যে তাহা কাহারো ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্তক্ষেপ করে না। যাহার যে ধর্ম্ম সে তাহা অকাতরে পালন করিতে পারে। মতভেদের জন্য কাহাকেও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। বিজিত প্রজা বলপূর্ব্বক জেতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হয় না। সেকালে অঙ্গিয়র (Aungier) নামে একজন প্রতিভাশালী সুচতুর গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার সময়ে দিউ হইতে বণিকেরা বোম্বায়ে আসিয়া বাণিজ্য করিতে চাহে। তাহাদিগকে উৎসাহ দানার্থ গবর্ণর সাহেব তাহাদের সঙ্গে যে করার বন্ধন করেন তাহাহইতে তাঁহার বুদ্ধিমত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহার মর্ম্ম এই যে বণিকেরা স্বাধীন ভাবে তাহাদের শবদাহন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন—তাহার জাতি ও অবস্থা যাহাই হউক, বলপূর্ব্বক কাহাকেও খৃষ্টান করা যাইবে না। এই করার পত্রের তারিখ ২২ মার্চ ১৬৭৭। বণিকেরা সেই অবধি এপর্য্যন্ত 'ব্যাক্‌বের' তীরে অবাধে তাহাদের শবদাহন করিয়া আসিতেছে ও ইচ্ছানুরূপ নিজ নিজ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতেছে।

পোর্টুগীজদের শাসন অন্যরূপ। তাহাদের এক হাতে তলবার এক হাতে বাইবেল—হয় খৃষ্টান হও নয় মর। তাহারা বলে, আমার রাজ্যে বাস করিতে চাও ত আমার ধর্ম্মগ্রহণ কর। ফলে কি হইল—ইংরাজের জয়—পোর্টুগীজদের পতন। ৩০০ বৎসর

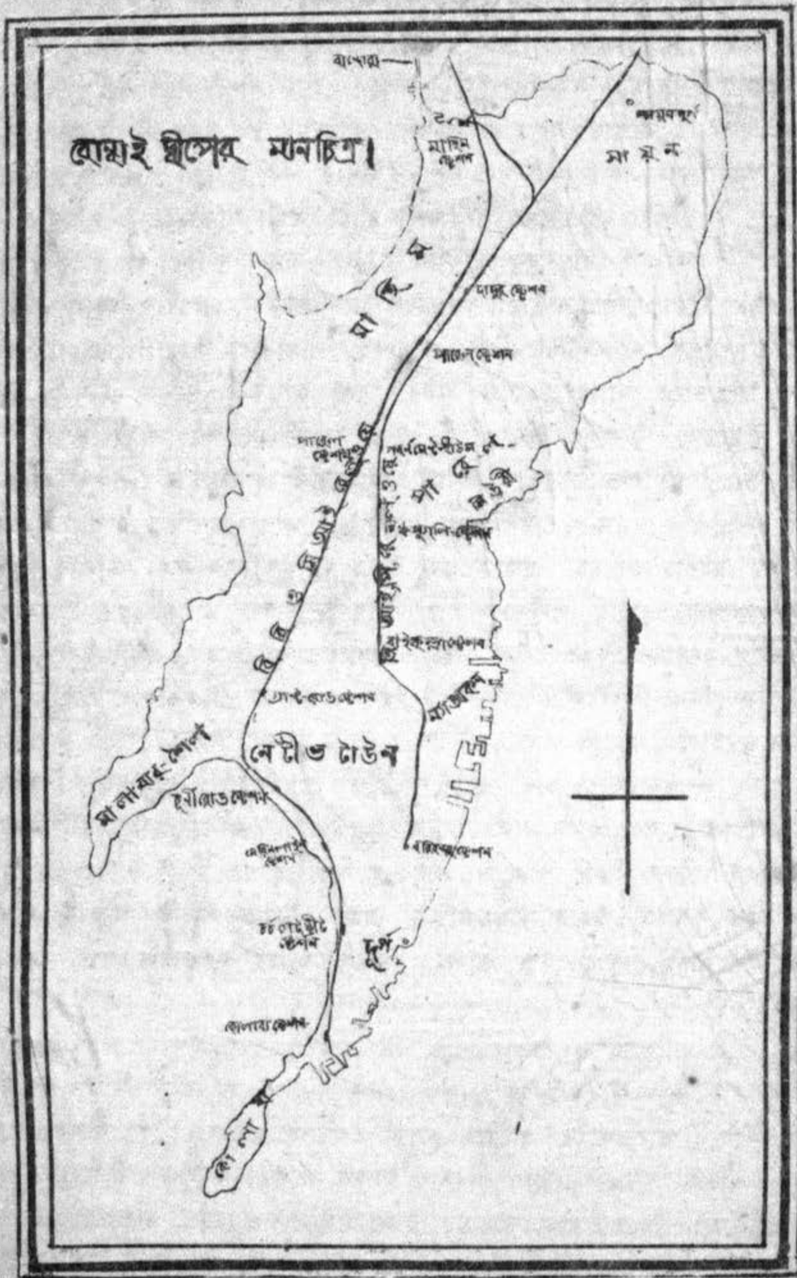

BY H C HALDER

পূর্ব্বে যে জাতি ধন মান বৈভবে সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল—যাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ কম্পমান তাহার নাম পর্য্যন্ত এক্ষণে শ্রুতিগোচর হয় না। তাহার রাজধানী গোওয়ার কি দশা হইয়াছে? তাহাদের দৌরাত্ম্যে কত লোকে দেশ ছাড়িয়া পালায় তার ঠিকানা নাই। আর ইংরাজ সুশাসনে এক্ষণে বোম্বায়ের অবস্থা দেখ। সাগর গর্ভ হইতে এই চিরবসন্ত সুন্দর পুরী সমুত্থিত হইল। বিশাল সুরম্য সৌধাবলীতে পরিপূর্ণ; শ্রমের জয়স্তম্ভ সুতা ও কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা চতুর্দ্দিকে বিরাজমান; নানা জাতির আবাসস্থান এই বোম্বাই পুরী সমুদ্রের উপরে রত্ন দ্বীপ তুল্য শোভা পাইতেছে।

মান চিত্র } একটা হস্তীদেহের পার্শ্বদেশ—মাথা হইতে সামনের পা পর্য্যন্ত মনে করিলে বোম্বায়ের আকার মোটামুটি কল্পনা করিতে পার। মনে কর শুঁড় ততটা নীচে ঝুলিয়া নাই পা বক্রভাবে আর একটু নীচের দিকে গিয়াছে। শুঁড় ও পায়ের মধ্যস্থিত অর্দ্ধচক্র Back bay উপসাগর ও মাথার বহির্ভাগে Breach Candy। শুঁড়ের প্রান্তভাগে মালাবার কোণ অথবা বিন্দু যেখানে গবর্ণমেন্ট হৌস সংস্থিত। তাহার উপরের বালুকেশ্বর রাস্তা ধরিয়া গেলে ম্যালাবার হিলে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাহার উত্তরে খম্বালার পাহাড়। এই দুই পাহাড়ের উপর ভাল ভাল বাঙ্গলা আছে—ইংরাজ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য বড়লোকের বাসস্থান। মালাবার হিল বোম্বায়ের মধ্যে লোভনীয় রমণীয় জায়গা। গজ মুণ্ডের উপর মহালক্ষীর মন্দির। হাতীর পায়ের ভাগটা কোলাবা, যাহার সমীপ-সমুদ্রের উপর দীপস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত। কোলাবার উপরিভাগে ময়দান (Esplanade) যাহা বোম্বায়ের কর্ম্মক্ষেত্র। ঐখানেই বণিক ও নাবিকদের কার্য্যালয় হাইকোর্ট ইউনিবর্সিটি স্তম্ভ ও ইমারত, সেক্রেতার আফিস, বড় বড় দোকান ও হোটেল প্রভৃতি সংস্থাপিত। আর একটু উপরে অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগে দিশি পাড়া, ভরপুর বসতির স্থান, সহরের হৃৎপিণ্ড। ধোবিতলাও, খেতবাড়ী, গিরগাম, কামাতীপুর ও পাড়ার এই সব নাম, সেখানে মার্কেট বাজার দোকান, সহরের গিলিজ ও ধূলি। এই পাড়ার উত্তর দিকে ভয়কলা, যে অঞ্চলের অলঙ্কার বিক্টোরিয়া উদ্যান ও এলফিনিষ্টন কালেজ, উহার কাছাকাছি যে রাস্তা গিয়াছে তাহাই পারলের রাস্তা, পারল আর একটি গবর্ণমেণ্টের আড্ডা। মানচিত্রে এই সকল স্থান স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

জনতা } বোম্বায়ে কতপ্রকার জাতি একত্র হইয়াছে তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। এমন জীবন্ত জলন্ত ভাব এদেশের অন্য কোন নগরে লক্ষিত হয় না। ইংরাজ শাসনে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা ইহাতেই মূর্ত্তিমতী। লোকদের আচার ব্যবহার আহার পরিচ্ছদ বাণিজ্য ব্যবসার উৎকর্ষ, সার্ব্বজনিক কার্য্যে উৎসাহ ও অনুরাগ এই সকল বিষয়ে ইংরাজ শাসনের সুফল প্রত্যক্ষ করা যায়। কতপ্রকার বিভিন্ন জাতি আছে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন ভজনালয়ই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কেল্লা হইতে

বাহির হইয়া কম্বাদেবীর রাস্তা ধরিয়া পারল পর্য্যন্ত দুই এক ক্রোশ চলিয়া যাও— কত জাতির মন্দির দেখিতে পাইবে চিত্র বিচিত্র হিন্দু মন্দির হইতে চং চং ঘণ্টা ধ্বনি উঠিতেছে। হাবসী আরব ও মুসলমানদের মসজিদ, পারসীদের অগ্নিগৃহ, ইহুদীদের সিনাগোগ, ইংরাজ গিরজা এসব একে একে দৃষ্টি পথে পতিত হইবে। ময়দানে দেখিবে মুসলমান সন্ধ্যানমাজের জন্য কার্পেট বিছাইতেছে তাহার পাশে হয়ত একজন পারসী অস্তাচল চূড়াবলম্বী দিনমণির স্তুতিমন্ত্র পাঠ করিতেছে। আর এক দৃশ্য দেখা যায় নানা জাতীয় ভদ্র কুলকামিনীগণ এখানে অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ভাবে বিচরণ করে। রুমালে কেশাবৃত রঙ্গীণ রেশমসাড়ীপরিহিত সুরূপা পারসী স্ত্রী এই দৃশ্যের বিশেষ শোভা। নগরবাসীগণ বাঙ্গালীদের মত স্বল্পবস্ত্র শূন্যশিরস্ক নয়। বহুরূপী পাগড়ী তাহাদের শিরোভূষণ, এক এক জাতির এক এক ধরণের পাগড়ী। গুজরাতীদের গজ মুণ্ড—মহারাষ্ট্রীদের রথ চক্র—সিন্ধিদের বিপর্য্যস্ত ইংরাজি হ্যাট, মুসলমানদের জরির মোগলাই পাগড়ী, পারসীদের লম্বা ত্রিকোণ্ টুপী। তুমি শুনিয়া থাকিবে পশ্চিমের লোকেরা বাঙ্গালীদের লঙ্ঘাশির বলিয়া উপহাস করে। কলিকাতা ও বোম্বায়ের ভাব এ বিষয়ে অনেক ভিন্ন। এই দুই সহরের বাহ্য প্রভেদ দুকথায় নির্দ্দেশ করিতে হইলে বলা যাইতে পারে—কলিকাতা আটপৌরে—বোম্বাই পোষাকি সহর।

ন্যায় ধর্ম্ম।

প্রুসিয়ার "মহৎ" উপাধিপ্রাপ্ত ফ্রেড্রিক্ সম্রাট রাজধানী হইতে কিছু দূরে একটি বাগানবাড়ি নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যখন সমস্ত বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গেল তখন শুনিতে পাইলেন যে, একজন কৃষকের একটি শস্য চূর্ণ করিবার জাঁতাকল-গৃহ মাঝে পড়াতে তাঁহার বাগান সম্পূর্ণ হইতে পারিতেছে না। বিস্তর টাকার প্রলোভনেও কৃষক তাহার গৃহ উঠাইয়া লইতে রাজি হয় নাই শুনিয়া সম্রাট্ কৃষককে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এত টাকা পাইতেছ তবু কেন ঘর ছাড়িতেছ না?" কৃষক উত্তর করিল—"ইহা আমার পৈতৃক গৃহ। ঐ খানেই আমার পিতা তাঁহার জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন ও মরিয়াছেন, এবং ঐ খানেই আমার পুত্রের জন্ম হইয়াছে, আমি উহা বেচিতে পারিব না।"

সম্রাট কহিলেন "আমি ঐস্থানে আমার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে চাহি।"

কৃষক কহিল "মহারাজ বোধ করি বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ঐ জাঁতাকলের ঘর আমার প্রাসাদ।"

সম্রাট কহিলেন—"তুমি যদি বিক্রয় না কর ত ঐ গৃহ আমি কাড়িয়া লইতে পারি।"

কৃষক কহিল "না পারেন না; বর্লিন্ নগরে বিচারক আছে।"

এই কথা শুনিয়া সম্রাট কৃষকের ঘরে আর হস্তক্ষেপ করিলেন না। তিনি ভাবিলেন রাজারা আইন গড়িতে পারেন কিন্তু আইন ভাঙ্গিতে পারেন না। কৃষকের সেই জাঁতা-কল আজ পর্য্যন্ত সম্রাটের উদ্যানে রহিয়াছে।

গুজরাটের রাণীর সম্বন্ধে এইরূপ আরেকটি গল্প প্রচলিত আছে। বহু পূর্ব্বের কথা। তখন গুজরাট সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। রাণীর নাম মীনল দেবী। তাঁহার রাজত্ব কালে ধোলকা গ্রামে তিনি "মীনল তলাও" নামে একটি পুষ্করিণী খনন করাইতেছিলেন। ঐ পুষ্করিণীর পূর্ব্বদিকে একটি দুশ্চরিত্রা রমণীর বাসগৃহ ছিল। সেই গৃহ থাকাতে পুষ্করিণীর আয়তনসামঞ্জস্যের ব্যাঘাত হইতেছিল। রাণী অনেক অর্থ দিয়া সেই ঘর ক্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৃহকর্ত্রী মনে করিল, পুষ্করিণী খনন করাইয়া রাণী যেরূপ কীর্ত্তিলাভ করিবেন, পুষ্করিণী খননের ব্যাঘাত করিয়া আমারও তেমনি একটা নাম থাকিয়া যাইবে। এই বলিয়া সে গৃহ বিক্রয় করিতে অসম্মত হইল। রাণী কিছুমাত্র বল প্রয়োগ করিলেন না। গৃহ সেইখানেই রহিল। আজিও মীনল তলাওয়ের পূর্ব্ব দিকের সীমা অসমান রহিয়াছে। সেই অবধি উক্ত প্রদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে "ন্যায়ধর্ম্ম দেখিতে চাও ত মীনল তলাও যাও।"

চন্দ্রপুরের হাট।

(বালকের রচনা)

চন্দ্রপুর হাট নদীর খুব নিকটেই। নদী হইতে উঠিয়া একটী সরু গলির মতন রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া খানিকটা যাইলেই হাট।

রাস্তাটী অত্যন্ত সরু। দুই জনের অধিক মনুষ্য একসঙ্গে পাশাপাশি যাইতে পারে না। রাস্তার দুইধারে গাছপালা জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক একটী পর্ণকুটীর। কিন্তু কুটীরগুলির দরজা এই সরু রাস্তার দিকে নয়। এই রাস্তাটীতে বর্ষাকালে প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়। অন্যান্য সময়েও রাস্তাটী কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় আবার দু' একটা লতাগাছ এদিক হইতে ওদিকে গিয়াছে। অনেক সময় মুটেদের মাথার মোট লাগিয়া লতাগাছগুলি ছিঁড়িয়া যায়। এই পথটী দিয়া যাই-লেই হাট।

হাটের দিন এই পথ দিয়া সমস্ত দিনই লোকজন যাতায়াত করে। সকলেরই মুখে

একটা ব্যস্ত সমস্ত ভাব। কাহারও মুখে বড় একটা হাসিখুসীর ভাব পাওয়া যায় না। সকলেই গম্ভীর। এই পথের সম্মুখেই নদী।

নদীর ধারে সারি সারি নৌকা। কোন নৌকায় আলুপটল কোন নৌকায় শাক্ সব্‌জি কোন নৌকায় হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি রহিয়াছে। নৌকার মাঝিরা এ ওকে ডাকে ও তাকে ডাকে এইরূপ ব্যস্ত। কোন মাঝি হয়ত কাঁচকলা তুলিতেছে, কোন মাঝি হয়ত হাত নাড়া দিয়া কাহাকেও ডাকিতেছে, আবার কোন মাঝি হয়ত দাঁত খিঁচাইয়া কাহাকেও তাড়া দিয়াছে। মাঝির পাশেই একজন গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই এই সকল জিনিসের অধিকারী। সে ভারি ব্যস্ত—একে ডাকে ওকে ডাকে তাকে ধমকায় কেবল ইহাই করিতেছে।

নদী হইতে যে পথটী গিয়াছে সেই পথ দিয়া জিনিসপত্র যায় বটে কিন্তু জনসাধারণ সে পথ দিয়া বড় একটা কেহ যায় না। আমরা একবার জনসাধারণ যে পথ দিয়া হাটে প্রবেশ করে সেই পথ দিয়া যাই। এপথটী চন্দ্রপুরের বাবুরা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন সেই জন্য ইহার নাম "বাবুদের রাস্তা" হইয়াছে।

এ পথটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীতীরের পথের ন্যায় অপ্রশস্ত ও কর্দ্দমময় নহে। পথটী বরাবর চন্দ্রপুরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পথের দুই ধারে জল যাইবার জন্য নালা কাটা আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইলে পথে জল না দাঁড়াইয়া এই সকল নালা দিয়া গিয়া একেবারে নদীতে পড়ে। নালার ধারে ধারে বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। নালার ওদিকে বাঁশঝাড় আমবাগান নীচুবাগান ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল গাছ-পালার মধ্য হইতে এক একটী ক্ষুদ্র কুটীর উঁকি মারিতেছে। এই পথের ধারেই হাট।

হাট প্রতি শনি মঙ্গলবারে বসে এবং ইহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। বিশে-শতঃ পর্ব্বোপলক্ষে হাটে ভয়ানক জনতা হয়। বারোয়ারি পূজার সময় ভিড়ে একটা গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সময় সময় চন্দ্রপুরের বাবুরা জনতা নিবারণের জন্য হাটে চার পাঁচ জন দ্বারবান রাখিয়া দেন।

হাটে প্রবেশ করিয়াই একটী প্রকাণ্ড বটগাছ। গাছটীর তলায় জনকতক দোকা-নদার বসিয়া তামাকু টানিতেছে ও ক্রেতাগণের সহিত দরকষাকষি করিতেছে। এই গাছটীর পরেই একটী কামিনীফুলের গাছ। কামিনীগাছটীর তলায় বসিয়া একজন ত্রেতাযুগের বুড়ী হাঁড়ী কলসী ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কোনও জায়গায় একটী আম্র বৃক্ষের তলে বসিয়া কেহ কতকগুলা আতা বিক্রয় করিতেছে, কোথাও একটী গুন্‌চটের পরে বসিয়া এক বুড়ী আমড়া বিক্রয় করিতেছে, কেহ হয়ত হাজার দু'হা-জার জাম লইয়া একজায়গায় বসিয়া রহিয়াছে এবং "ওগো মশায় এই আমার কাছে নেও'সে খুব ভাল জাম" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। মেছুনীরা নানাজাতের মাছ লইয়া বসিয়া আছে হয়ত একজন ক্রেতা চারি আনার জায়গায় দুই আনা বলি-

য়াছে অমনি পালে পালে মেচুনী একেবারে নথ নাড়া দিয়া তাহাকে খাইতে আসিয়াছে। দু'একজন মেচুনী এক আধ টান তামাকু টানিতেও ছাড়িতেছে না। একজায়গায় জনকতক তন্তুবায় মোটা মোটা কাপড় লইয়া বসিয়াছে এবং ক্রেতাকে "আর দু'গণ্ডা পয়সা দিও আর দুগণ্ডা পয়সা দিও" বলিয়া ডাকিতেছে। খরিদ্দারও "হবে না হবে না" করিতে করিতে চলিয়াছে। তন্তুবায়গণ "আচ্ছা নাওসে গো" বলিয়া খরিদ্দারকে ডাকিতেছে এবং নিকটে আসিলে "আর দু'ট পয়সা দিয়ে যাও" বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া খরিদ্দারের কথানুযায়ী মূল্য লইয়াই ছাড়িয়া দিতেছে। হাটের মধ্যে এইরূপ ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যতদূর সম্ভব দর কষাকষি চলিয়াছে।

আজ মঙ্গলবার। দ্বিপ্রহর। একটুও বাতাস নাই এমন কি একটী গাছের পাতাও নড়িতেছে না। স্নানের বেলা হইল লোকে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেকেই অল্প কথায় চটিয়া গরম হইয়া উঠিতেছে।

হাটের মাঝখান দিয়া একটী বেশ প্রশস্ত পথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার ও একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান চলিয়াছে। হাটটী চন্দ্রপুরের বাবুদের এই জন্য তাঁহারা প্রতি হাটে তোলা পাইয়া থাকেন। কেহ একটা মৎস্য কেহ আধসের আলু, কেহ গোটাকতক কাঁচকলা, আবার কেহ কেহ দুই তিনটী পয়সা দিয়া থাকে। ইহারা সেই তোলা আদায় করিয়া বেড়ায়।

আমাদের ঘোষেদের বাড়ির মধুসূদন, গায়ে তেল মাখা, গলায় কাঠের মালা, কাঁধে গামছা, হাতে ঝুড়ি, আম্র বৃক্ষের তলায় গিয়া কতকগুলি শাক্‌সব্‌জির দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বিক্রেতাকে কহিল "এ কত করে?"

সে বলিল "আধ পয়সা।"

মধুসূদন কহিল "কড়ি আছে?"

সে বলিল, "আছে।"

এই বলিয়া সে অর্দ্ধ পয়সার কড়ি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন তাহাকে একটী পয়সা দিয়া কতকগুলি পূঁই শাক্ লইয়া চলিল। আজ আহারের বাবস্থাটা হইবে ভাল।

এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি অনেকটা ম্রিয়মান হইয়া আসিয়াছে। দু একটী সাদা সাদা মেঘ দূরস্থিত বৃক্ষাবলীর মস্তকের পরে ঢুলিয়া পড়িতেছে। হাটের অধিকাংশ লোকই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। দুই চারিজন দোকানদার কত পয়সা পাইয়াছে তাহাই গণিতেছে। নদীতীরে কেবল একখানি মাত্র নৌকা আছে, আর সমস্ত নৌকা ফিরিয়া গিয়াছে। "বাবুদের রাস্তা" দিয়া মাঝে মাঝে রাখালেরা এক এক পাল গরু চরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুব ধুলা উড়ায় ধুম পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাভী হম্বা হম্বা রবে ডাকিতেছে। ঐ দেখ, একটি লোক এখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই। নদী তীরে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে কিন্তু এখনও একটু একটু আলো আছে। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে নীলিমা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটীয়াছে। পাখীগুলি চারিদিক হইতে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থানের দিকে চলিয়াছে। আকাশের এক বিজন প্রান্তে একটা ক্ষুদ্র তারকা আপন মনে চাহিয়া আছে। লোকটা এই সময়ে আবার হাটে প্রবেশ করিল।

হাট এখন জনশূন্য। সেথায় একটীও জনপ্রাণী নাই। গাছগুলি মস্তক অবনত করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে দু একটী পরিত্যক্ত খড়ের চাল চারটে বাঁশের খুঁটির উপর দাঁড়াইয়া। হাটের মধ্যস্থিত পথটার স্থানে স্থানে দু একটী শাক্‌সবজির পাতা ডাঁটা ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটা এই পথদিয়া বরাবর চলিতেছে।

তাহার হস্তে একটী গামছা রহিয়াছে। সেই গামছায় কতকগুলি ফল মূল বাঁধা আছে। লোকটী ধীরে ধীরে এই পথ দিয়া আসিয়া "বাবুদের রাস্তায়" উপস্থিত হইল।

নগরপ্রান্তে একটী ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। কুটীরের সম্মুখে কতকগুলি গাছপালা রহিয়াছে। এই গাছপালা গুলির এক পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র ডোবা। এই ডোবার দুই চারি হাত তফাতেই কুটীর দ্বার। দ্বারের এক পার্শ্বে গোটাকতক ঘাস আর এক পার্শ্বে গোটাকতক ধানের গাছ গজাইয়াছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে একটু ছোট বারাণ্ডা মতন আছে, বারাণ্ডার এক পার্শ্বে ঢেঁকি। ঘরের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি সাজান রহিয়াছে, কোনও হাঁড়ীতে চারিটী চাউল, কোনও হাঁড়ীতে চারিটী কলাই, কোনও হাঁড়ীতে চারিটী ক্ষুদ ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরের কোণে ইন্দুরের গর্ত্ত। ইন্দুর মহাশয়গণ সুরঙ্গ পথ দিয়া আসিয়া কুটীরস্বামীর দানশীলতার পরিচয় লইয়া থাকেন এবং কিচিকিচি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। কুটীরস্বামী কলিযুগের লোক এই জন্য তিনি এরূপ নিঃস্বার্থ উপকারী-দিগকে মারিবার চেষ্টায় ফিরিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কৃতকার্য্য হয়েন। এই ঘরের লাগাও আর একটী ঘর আছে। ঘরের উপর হইতে একটী বাঁশ ঝুলিতেছে। সেই বাঁশের পরে কতকগুলি ময়লা কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের এক পার্শ্বে একটা সিন্ধুক। তাহার উপরে একখানি মাদুর পড়িয়া আছে। ইহা ভিন্ন সে ঘরে অন্য কোন আসবাব নাই। উঠানের অপর দিকে যে দু একটী ঘর আছে তাহারা আরও ক্ষুদ্র সেই জন্য তাহাদের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

লোকটী কুটীর দ্বারে গিয়া বারকতক "দরজা খোল দরজা খোল" বলিয়া কাহাকে ডাকিল, দরজা শীঘ্রই খুলিয়া গেল। লোকটী আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল।

এক্ষণে বেশ অন্ধকার হইয়াছে। সূর্য্যতেজ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। অসংখ্য তারকামালা আকাশবক্ষে শোভা পাইতেছে। জোনাকীপোকা এক একবার টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ করিতেছে। লোকটী আপন গৃহে পঁহুছিয়াছে এবং আমরা তাহাকে পঁহুছাইয়া দিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছি।

বীর গুরু।

বনের একটা গাছে আগুন লাগিলে অন্যান্য যে সকল গাছে উত্তাপ প্রচ্ছন্ন ছিল সে গুলাও যেমন আগুন হইয়া উঠে, তেমনি যে জাতির মধ্যে একজন বড়লোক উঠে, সে জাতির মধ্যে দেখিতে দেখিতে মহত্বের শিখা ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে তাহার গতি আর কেহই রোধ করিতে পারে না।

নানক যে মহত্ব লইয়া জন্মিয়াছিলেন সে তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই নিবিয়া গেল না। তিনি যে ধর্ম্মের সঙ্গীত, যে আনন্দ ও আশার গান গাহিলেন, তাহা ধ্বনিত হইতে লাগিল। কত নূতন নূতন গুরু জাগিয়া উঠিয়া শিখদিগকে মহত্বের পথে অগ্রসর করিতে লাগিলেন।

তখনকার যথেচ্ছাচারী মুসলমান রাজারা অনেক অত্যাচার করিলেন, কিন্তু নব ধর্ম্মোৎসাহে দীপ্ত শিখ্‌জাতির উন্নতির পথে বাধা দিতে পারিলেন না। বাধা ও অত্যাচার পাইয়া শিখেরা কেমন করিয়া বীর জাতি হইয়া উঠিল তাহার গল্প বলি শুন।

নানকের পর পঞ্জাবে আটজন গুরু জন্মিয়াছেন, আটজন গুরু মরিয়াছেন, নবম গুরুর নাম তেগ্‌ বাহাদুর। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন নিষ্ঠুর আরংজীব দিল্লির সম্রাট ছিলেন। রামরায় বলিয়া তেগ্‌ বাহাদুরের একজন শত্রু সম্রাটের সভায় বাস করিত। তাহারই কথা শুনিয়া সম্রাট তেগ্‌ বাহাদুরের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন।

আরঙ্গীবের লোক যখন তেগ্‌ বাহাদুরকে ডাকিতে আসিল তখন তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার আর রক্ষা নাই। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার ছেলেকে কাছে ডাকিলেন। ছেলের নাম গোবিন্দ, তাহার বয়স চোদ্দ বৎসর। পূর্ব্ব পুরুষের তলোয়ার গোবিন্দের কোমরে বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমিই শিখেদের গুরু হইলে। সম্রাটের আদেশে ঘাতক আমাকে যদি বধ করে ত আমার শরীরটা যেন শেয়াল কুকুরে না খায়। আর এই অন্যায় অত্যাচারের বিচার তুমি করিও, ইহার প্রতিশোধ তুমি লইও।" বলিয়া তিনি দিল্লি চলিয়া গেলেন।

রাজসভায় তাঁহাকে তাঁহার গোপনীয় কথা সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করা হইল। কেহ বা বলিল, "আচ্ছা, তুমি যে মস্ত লোক, তাহার প্রমাণ স্বরূপ একটা অলৌকিক কারখানা দেখাও দেখি!" তেগ্‌বাহাদুর বলিলেন—"সে ত আমার কাজ নহে। মানুষের কর্ত্তব্য ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া থাকা। তবে তোমাদের অনুরোধে আমি একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইতে পারি। একটা কাগজে মন্ত্র লিখিয়া ঘাড়ে রাখিয়া দিব, সে ঘাড় তলোয়ারে বিচ্ছিন্ন হইবে না।" এই বলিয়া মন্ত্র-লেখা কাগজ ঘাড়ে রাখিয়া তিনি ঘাড়

পাতিয়া দিলেন। ঘাতক তরবারী উঠাইয়া আঘাত করিল। মাথা বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কাগজ তুলিয়া লইয়া সকলে দেখিল, তাহাতে লেখা আছে—"শির দিয়া, সির্ নেহি দিয়া।" অর্থাৎ "মাথা দিলাম, গুপ্তকথা দিলাম না।" এইরূপে মাথা দিয়া তেগ্‌বাহাদুর রাজসভার প্রশ্নের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

বালক গোবিন্দের মনে বড় আঘাত লাগিল। মুসলমানদের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবেন এই তাঁহার সঙ্কল্প হইল। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে ত কিছুই হয় না—এখনও সুসময়ের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে, আয়োজন করিতে হইবে, বহুদিন অবিশ্রাম চিন্তা করিয়া মনে মনে সমস্ত সঙ্কল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে, তবে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যাহারা দুই দিনেই দেশের উপকার করিয়া সমস্ত চুকাইয়া দিতে চায়, যাহাদের ধৈর্য্য নাই, যাহারা অপেক্ষা করিতে জানে না, তাহাদের তড়িবড়ি কাজ ও আড়ম্বর দেখিয়া লোকের চমক লাগিয়া যায়, কিন্তু তাহারা বড় লোক নহে তাহাদের কাজ স্থায়ী হয় না। তাহারা তাহাদের উদ্দেশ্যের জন্য সমস্ত জীবন দিতে চাহে না, জীবনের গোটাকতক দিন দিতে চাহে মাত্র, অথচ তাড়াতাড়ি বড় লোক বলিয়া খুব একটা প্রশংসা পাইতে চাহে। গোবিন্দ সেরূপ লোক ছিলেন না। তিনি প্রায় কুড়িবৎসর ধরিয়া যমুনা তীরের ছোট ছোট পাহাড়ের মধ্যে বিজনে পারস্যভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; বাঘ ও বন্য শূকর শিকার করিয়া এবং মনে মনে আপনার সঙ্কল্প স্থির করিয়া অবসরের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

গুরুগোবিন্দের শিষ্যেরা তাঁহার চারিদিকে জড় হইতে লাগিল। সমস্ত শিখজাতিকে একত্রে আহ্বান করিবার জন্য তিনি চারিদিকে তাঁহার শিষ্যদিগকে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত পাঞ্জাব হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন—দেব-দৈত্য সকলেই নিজের উপাসনা প্রচলিত করিতে চায়; গোরখনাথ রামানন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তকেরা নিজের নিজের এক একটা পন্থা বাহির করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবার সময়ে মহম্মদ নিজের নাম উচ্চারণ করিতে আদেশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি, গোবিন্দ, ধর্ম্মপ্রচার, পুণ্যের জয় বিস্তার ও পাপের বিনাশ সাধনের জন্য আসিয়াছেন। অন্যান্য মানুষও যেমন তিনিও তেমনি একজন; তিনি পিতা পরমেশ্বরের দাস; এই পরমাশ্চর্য্য জগতের একজন দর্শক মাত্র; তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া যে পূজা করিবে নরকে তাহার গতি হইবে। কোরাণ পুরাণ পাঠ করিয়া, প্রতিমা বা মৃত ব্যক্তির পূজা করিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে বা কোন প্রকার পূজার কৌশলে ঈশ্বর মিলে না। বিনয়ে ও ভক্তিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

তিনি বলিলেন—আজ হইতে সমস্ত লোক এক হইয়া গেল। উচ্চ নীচের প্রভেদ রহিল না। জাতিভেদ উঠিয়া গেল। সকলে অত্যাচারী তুর্ক জাতির বিনাশের ব্রত গ্রহণ করিলাম।

জাতিভেদ উঠিয়া গেল শুনিয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের অনেকে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল, অনেকে রাগ করিয়া চলিয়া গেল। গোবিন্দ বলিলেন, যাহারা নীচে আছে তাহাদিগকে উঠাইব, যাহাদিগকে সকলে ঘৃণা করে তাহারা আমার পাশে স্থান পাইবে। ইহা শুনিয়া নীচজাতির লোকেরা অত্যন্ত আনন্দ করিতে লাগিল। এই সময়ে গোবিন্দ সমস্ত শিখ্‌জাতিকে সিংহ উপাধি দিলেন। কুড়িহাজার লোক গোবিন্দের দলে রহিল।

এইরূপে গোবিন্দ শিখজাতিকে নূতন উৎসাহে দীপ্ত করিয়া, ধনমানের আশা বিসর্জন করিয়া নিজের সঙ্কল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোবিন্দের যদি মানের আশা থাকিত তাহা হইলে তিনি অনায়াসে আপনাকে দেবতা বলিয়া চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ধনের প্রতি গোবিন্দের বিরাগ সম্বন্ধে একটা গল্প আছে বলি। গোবিন্দের একজন ধনী শিষ্য তাঁহাকে পঞ্চাশ হাজার টাকার মূল্যের একজোড়া বলয় উপহার দিয়াছিল। গোবিন্দ তাহার মধ্য হইতে একটি বলয় লইয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিলেন। দৈবাৎ পড়িয়া গেছে মনে করিয়া একজন শিখ্ পাঁচশত টাকা পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া একজন ডুবারীকে সেই বলয় খুঁজিয়া আনিতে অনুরোধ করিল। সে বলিল আমি খুঁজিয়া আনিতে পারি, যদি আমাকে ঠিক জায়গাটা দেখাইয়া দেওয়া হয়। শিখ গোবিন্দকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বালা কোন্‌খানে পড়িয়া গেছে। গোবিন্দ অবশিষ্ট বালাটি লইয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন—"ওই খানে।" শিখ্ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া আর খুঁজিল না।

হিমালয়ের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজাদের সঙ্গে গুরু গোবিন্দের এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে গোবিন্দের জয় হয়। মুখোয়াল নামক স্থানে থাকিয়া গোবিন্দ চারিটি নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দুই বৎসর যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া চারিদিকের অনেক দেশ জয় ও অধিকার করিলেন। পর্ব্বতের রাজারা ইহাতে ভয় পাইয়া দিল্লির সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল। জবর্দস্ত খাঁ ও শমস্ খাঁ নামক দুই আমীরকে সম্রাট পার্ব্বত্য রাজাদের সাহায্যে নিয়োগ করিলেন। এইরূপে দুই মুসলমান আমীর এবং পর্ব্বতের রাজারা একত্র হইয়া মুখোয়াল দুর্গ ঘিরিয়া ফেলিল। দুর্গের বাহিরে সাতমাস ধরিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। অবশেষে গোবিন্দ তাঁহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তাঁহার আহার ফুরাইয়া গেল। তাহা ছাড়া গোবিন্দের অনুচরেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এ দিকে তাঁহার মা গুজরী একদিন রাত্রে গোবিন্দের দুটি ছেলে লইয়া দুর্গ হইতে পালাইয়া গেলেন। কিন্তু ছেলে দুটিকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। পথের মধ্যে সির্হিন্দ নামক স্থানে মুসলমানেরা তাহাদিগকে জীবিত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলে। গুজরী সেই শোকে প্রাণত্যাগ করেন। এদিকে আহারাভাবে গোবিন্দ অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। তাঁহার অনুচরেরা আর থাকিতে চাহে না। তিনি তাহাদিগকে ভীরু

বলিয়া ভৎর্সনা করিলেন। দুর্গের দরজা খুলিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"এস তবে আরেকবার যুদ্ধ করিয়া দেখা যাক্। যদি মরি তাহা হইলে কীর্ত্তি থাকিয়া যাইবে, যদি জয়লাভ করি তবে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইল। বীরের মত মরিলে গৌরব আছে ভীরুর মত মরা হীনতা!" কিন্তু গোবিন্দের কথা কেহ মানিল না। তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখিয়া অনুচরেরা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া গেল। কেবল চল্লিশ জন গোবিন্দের সঙ্গে রহিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে বলিলেন "তোমরাও যাও!" তাহারা বলিল "যে শিখেরা ছাড়িয়া পালাইয়াছে তাহাদিগকে মাপ কর গুরু, আমরা তোমার জন্য প্রাণ দিব।" এই চল্লিশজন অনুচর সঙ্গে লইয়া মুখোয়াল হইতে পালাইয়া গুরু চমকৌর দুর্গে আশ্রয় লইলেন। সেখানেও বিপক্ষেরা তাঁহাদিগকে ঘিরিল। প্রাতঃকালে দুর্গের দ্বার খুলিয়া তাঁহারা মুসলমানদের উপর গিয়া পড়িলেন। বিপক্ষপক্ষের অনেকগুলিকে মারিলেন এবং তাঁহাদেরও অনেকগুলি মরিল। কেবল পাঁচজন মাত্র বাকি রহিল। গোবিন্দের দুই পুত্র রণজিৎ ও অজিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। গোবিন্দ আবার পলায়ন করিলেন। বহুদিন ধরিয়া পথে অনেক বিপদ আপদ সহ্য করিয়া অবশেষে গোবিন্দ একে একে পলাতক শিষ্যদিগকে সংগ্রহ করিয়া লইলেন। এইরূপে গোবিন্দের অধীনে বারোহাজার সৈন্য জড় হইল।

মুসলমানেরা এই খবর পাইয়া তাঁহাকে আবার আক্রমণ করিল। শিখেরা বলিল, এবারে হয় জয় করিব নয় মরিব। জয় হইল। মুকতসরের নিকট যুদ্ধে মুসলমানদের সম্পূর্ণ হার হইল। এই জয়ের খবর চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। প্রত্যহ চারিদিক হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া গোবিন্দের দলে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সম্রাট্ আরঙ্গীব তখন দক্ষিণে ছিলেন। গোবিন্দের জয়ের সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। তাঁহার কাছে হাজির হইবার জন্য গোবিন্দকে এক আদেশপত্র পাঠাইয়া দিলেন। গোবিন্দ তাহার উত্তরে লিখিয়া পাঠাইলেন—"তোমার উপরে আমার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই। তুমি আমাদের প্রতি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছ শিখেরা তাহার প্রতিশোধ লইবে।" গোবিন্দ তাঁহার পত্রে, মোগলেরা শিখগুরুদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন "আমার সন্তানেরা বিনষ্ট হইয়াছে; আমার পৃথিবীর সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিয়া আছি; আমি কাহাকেও ভয় করি না, ভয় করি কেবল জগতের একমাত্র সম্রাট্ রাজার রাজাকে। ভগবানের নিকট দরিদ্রের প্রার্থনা বিফল হয় না; তুমি যে সকল অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছ এক দিন তাহার হিসাব দিতে হইবে।" এই পত্রে গোবিন্দ সম্রাট্‌কে লিখিয়াছিলেন যে, "তুমি হিন্দুদিগকে মুসলমান করিয়া থাক, আমি মুসলমানদিগকে হিন্দু করিব। তুমি আপনাকে নিরাপদ ভাবিয়া সুখে আছ, কিন্তু সাবধান, আমি চড়াই পাখীকে শিখাইব বাজপাখীকে কি করিয়া ভূমিশায়ী করিতে হয়!" পাঁচ জন শিখের

হাত দিয়া এই চিঠি গোবিন্দ সম্রাটের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সম্রাট সেই চিঠি পড়িয়া ক্রুদ্ধ না হইয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন ও সেই পাঁচ জন শিখের হাত দিয়া গোবিন্দকে চিঠি ও সওগাদ পাঠাইয়া দিলেন। চিঠিতে লিখিয়া দিলেন, যে, গোবিন্দ যদি দাক্ষিণাত্যে আসেন তবে সম্রাট্ তাঁহাকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিবেন। এই চিঠি পাইয়া গোবিন্দ কিছুদিন শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আরঙ্গীবের সহিত সাক্ষাত করাই স্থির করিলেন ও সেই অভিপ্রায়ে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। তিনি যখন পথে তখন আরংজীবের মৃত্যু হইয়াছে। দক্ষিণে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বাহাদুর সা সম্রাট হইয়াছেন। বাহাদুর সা বহুবিধ সওগাদ উপহার দিয়া গোবিন্দকে পাঁচহাজার অশ্বারোহীর অধিপতি করিয়া দিলেন।

গোবিন্দের মৃত্যু ঘটনা বড় শোচনীয়। কেহ কেহ বলে, ক্রমাগত শোকে বিপদে নিরাশায় অভিভূত হইয়া গোবিন্দ শেষ দশায় কতকটা পাগলের মত হইয়াছিলেন ও জীবনের প্রতি তাঁহার অতিশয় বিরাগ জন্মিয়াছিল। এক দিন একজন পাঠান তাঁহার নিকট একটি ঘোড়া বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল; গোবিন্দ সেই ঘোড়া কিনিয়া তাহার দাম দিতে কিছু দিন বিলম্ব করিয়াছিলেন। অবশেষে পাঠান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে গালি দিয়া তরবারী লইয়া আক্রমণ করিল। গোবিন্দ পাঠানের হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কাটিয়া ফেলিলেন।

এই অন্যায় কার্য্য করিয়া তাঁহার অত্যন্ত অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি সেই পাঠানের পুত্রকে অনেক অর্থ দান করিলেন। তাহাকে তিনি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন এবং তাহার সহিত খেলা করিতেন। একদিন সেই পাঠানতনয়কে তিনি বলিলেন "আমি তোমার পিতাকে বধ করিয়াছি তুমি যদি তাহার প্রতিশোধ না লও তবে তুমি কাপুরুষ ভীরু।" কিন্তু সেই পাঠান গোবিন্দকে অত্যন্ত মান্য করিত, এই জন্য সে গোবিন্দের হানি না করিয়া মনে মনে পালাইবার সঙ্কল্প করিল।

আর একদিন সেই পাঠানের সহিত সতরঞ্চ খেলিতে খেলিতে গোবিন্দ তাহাকে তাহার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। সে আর থাকিতে না পারিয়া গোবিন্দের পেটে ছুরি বসাইয়া দিল।

গোবিন্দের অনুচরেরা সেই পাঠানকে ধরিবার জন্য চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিল। গোবিন্দ তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া বলিলেন "আমি উহার কাছে অপরাধ করিয়াছিলাম ও তাহার প্রতিশোধ দিয়াছে। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আমিই উহাকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলাম। উহাকে তোমরা ধরিও না।"

অনুচরেরা গোবিন্দের ক্ষতস্থান সেলাই করিয়া দিল। কিন্তু জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া গোবিন্দ এক দৃঢ় ধনুক লইয়া সবলে নোয়াইয়া ধরিলেন, সেই চেষ্টাতেই তাঁহার ক্ষতস্থানের সেলাই ছিঁড়িয়া গেল ও তাঁহার মৃত্যু হইল।

গোবিন্দ যে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, সে সঙ্কল্প বিফল হইল বটে কিন্তু তিনিই প্রধানতঃ শিখদিগকে যোদ্ধৃজাতি করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে একদিন শিখেরা স্বাধীন হইয়াছিল; সে স্বাধীনতার দ্বার তিনিই উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছিলেন।

বরিশালের পত্র।

বরিশাল কি রকম স্থান, এ অঞ্চলে আমার জাহাজের কাজ কেমন চল্‌চে জান্‌তে চেয়েছ। এখানে এসে এখানকার অবস্থা এই অল্প দিনে যত দূর জান্‌তে পেরেছি সংক্ষেপে তাই তোমাকে লিখ্‌চি।

বরিশাল সহরটি দেখ্‌তে অতি সুন্দর। সাম্‌নে দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্চে। নদীটি তেমন বড় নয়। নদীর ঘাটে অনেকগুলি বজ্‌রা ও নৌকা বাঁধা থাকে। আর এখন তো রোজই আমাদের ষ্টীমার যাতায়াত কর্‌চে। নদীর ধার দিয়ে বরাবর একটা পাকা রাস্তা গিয়েছে এই রাস্তায় সাহেব সুবোরা গাড়ি চড়ে হাওয়া খান—অনেক ভদ্র-লোক সকালে বৈকালে এখানে বেড়াতে আসেন। এই রাস্তার ও-ধারে কতকটা স্থান ব্যেপে সারি সারি ঝাউ গাছ। এই ঝাউগাছগুলিতে নদীর ধারের বড় শোভা হয়েছে। সহরের চারিদিকেই বাগান বাগিচা। সুপারি নারিকেল ঝাউ আঁব কাটালের গাছে সমস্ত স্থান যেন ছেয়ে রয়েছে। চারদিক থেকে কোকিল পাপিয়া ডাক্‌চে, আর কত রকম পাখি শিস্ দিচ্চে। এই সমস্ত মিলে একটি একতান সঙ্গীত যেন রাত দিন উচ্ছ্বসিত হচ্চে। সহরের মধ্যে রাস্তার ধার দিয়ে ছোট ছোট খাল নালা গিয়াছে তাতে সর্ব্বদাই জল থাকে। এই খালগুলির সঙ্গে নদীর যোগ আছে। নদীর জোয়ার-ভাঁটা অনুসারে খালের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা খেলে। আবার, ইতস্ততঃ ছোট ছোট ঘাট-বাঁধান পুষ্করিণী। খালের সঙ্গে অনেকগুলি পুষ্করিণীর যোগ আছে। তাই তাদের জলও ভাল থাকে। এতেই বুঝ্‌তে পারচ, এখানকার লোকের জলকষ্ট নাই। আর, খালে জোয়ার ভাঁটা হওয়ায় সহরের ময়লা সব ধুয়ে যায়। এতেও লোকের স্বাস্থ্য অনেক ভাল থাকে। এখানে মধ্যে মধ্যে তোপের মত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়—কেন যে এ শব্দ হয় তার প্রকৃত কারণ কেউ ঠিক করে বলতে পারে না। কেউ কেউ বলেন, বঙ্গোপসাগরে যে অতলস্পর্শ আছে সেইখান থেকে শব্দ হয়। সাধারণের মধ্যে সংস্কার এই যে, লঙ্কায় রাবণ রাজার বাড়ির দরজা পড়ে, তাই এই রকম শব্দ হয়। এ অঞ্চলটাই নদ° নালায় পরিপূর্ণ। তাই জায়গাটা একটু স্যাঁৎসেতে, কিন্তু ভারি উর্ব্বরা। এখানে যেমন ধান হয় এমন আর কোথাও না। সমস্ত বালাম চাল এ প্রদেশ থেকেই কলকাতায় চালান হয়। এই এক

ফসলের উপরেই চাষাদের নির্ভর। অন্য ফসল যে এখানে হতে পারে না তা নয়। কিন্তু এই ধান এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে তাতেই তাদের গুজ্‌রান চলে যায়। তাই তারা অন্য ফসল তৈরি করতে মনোযোগ দেয় না—শিক্ষাও করে না। এক জন ভদ্রলোক আমাকে বল্‌ছিলেন, এমন কি, লাউ কুমড়ার গাছটা কি করে লাগাতে হয় তাও অনেকে জানে না। চাষারা এত আল্‌সে যে তাদের শেখাতে গেলেও শিখ্‌তে চায় না। ধান তৈয়ারি কর্‌তেও বেশি পরিশ্রম করতে হয় না। বীজ ছড়িয়ে দিলে প্রায় গাছ আপনি হয়ে উঠে। গাছ তৈরি হওয়া পর্য্যন্ত তবু একরকম তারা পরিশ্রম করে—কিন্তু একবার তৈয়ারি হয়ে উঠ্‌লে কাট্‌বার পরিশ্রম আর তারা স্বীকার করতে চায় না। অন্য প্রদেশের লোক এসে তাদের ধান কেটে দিয়ে যায়। আর, তার দরুণ তাদের পয়সা দেয়। এরূপ অদ্ভুত রীতি তো আর কোন প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় না।

এখানকার ভূমিতে যে অনেক প্রকার ফসল হতে পারে তার সন্দেহ নাই। এক জন ভদ্রলোক বলেছিলেন, তিনি কাঠা-কতক জমিতে এরোরুটের গাছ আর্জিয়ে এক শত টাকা লাভ করেছিলেন। এখানে সুপারি ও নারকেল খুব জন্মে। এ অঞ্চলে নলচিটি ও ঝালোকাটি কারবারের প্রধান স্থান। নলচিটি থেকে অনেক সুপারি কলকাতায় ও রেঙ্গুনে চালান হয়। সেই জন্য অনেক মগ ও চীনে সেখানে এসে বাস করে। ঝালোকাটি থেকে নারকেল, চাল, কাঠ, বেশি চালান হয়। বরিশাল সহর থেকে মাল বড় কিছু কলিকাতায় চালান হয় না। কিন্তু কলিকাতা থেকে কাপড়-চোপড় বাসন-কোষন অনেক জিনিসপত্র এখানে আসে। এখানে একটি লোন্‌-আফিস আছে। এখানে একটি দেশীয় জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী কর্তৃক এই আফিসটি স্থাপিত হয়। প্রায় লক্ষ টাকা ইহার মূল ধন। এ অঞ্চলে টাকার শুধ অত্যন্ত বেশি। কিন্তু উহাঁরা শতকরা ২৪ টাকার বেশি শুধ লয়েন না। হ—বাবু এই আফিসের সম্পাদক। ইনি একজন পাকা কার্য্যদক্ষ লোক—সকলেই ইঁহাকে কাজের লোক বলিয়া মান্য করে। ইঁহারই কার্য্যনৈপুণ্যে লোন্‌ আপিসের কাজটি বেশ চল্‌চে। তিনি বল্লেন, এইরূপ বাঙ্গালি জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী-স্থাপিত অনেকগুলি লোন্ আফিস পূর্ব্ববাঙ্গালা-অঞ্চলে আছে ও বেশ ভাল রকম চল্‌চে। কিন্তু বাঙ্গালী জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানীর দ্বারা চালিত অন্য কারবার তেমন এখানে সুসিদ্ধ হতে পারে নি। জয়েণ্ট ষ্টক্ কোম্পানী কর্তৃক চালিত কারবার বাঙ্গালীদের মধ্যে তেমন ভাল চলে না, তার অর্থ এই যে, অংশিদারগণ তেমন মনোযোগ, যত্ন, ও আগ্রহের সঙ্গে ষোলআনা আপনার ভেবে কাজের তত্ত্বাবধান করেন না। একজন ধনী হয়তো ১০০ টাকা কি ১০০০ টাকার অংশ ক্রয় করেছেন। তিনি মনে করেন, একশত টাকা কি এক হাজার টাকা গেলে তিনি মারা যাবেন না, কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে তাঁর না গেলেও হয়; যিনি manager আছেন তিনিই তো সব করচেন—ওর জন্য এত ভাবনা কি; সমস্ত কারবারটা যদি আমার একলার হত তাহলে বেশি দেখ্‌তে শুন্‌তে হত

বটে। এই রকম মনের ভাব হওয়ায় অনেক Director অর্থাৎ কর্ত্তা অংশিদার কার্য্যনির্ব্বাহ-সমিতিতে উপস্থিত হন না। হরকান্ত বাবু বল্লেন, উপস্থিত সভ্যের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ হয় না বলে অনেকবার সভার অধিবেশন স্থগিদ করতে হয়। যতটা আপনার স্বার্থ সেই পরিমাণে আমাদের কাজে যত্ন ও আগ্রহ হয়—সকলে একত্র হয়ে একটা বৃহৎ কারবার চল্‌চে এবং এই সাধারণ কার্য্যটা যাতে ভাল চলে তার দরুণ আমাদের প্রত্যেকের ষোল আনা নিজের কাজ মনে করে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য, এইরকম মনের ভাব আমাদের হয় না। যাকে বলে Public spirit অর্থাৎ "সাধারণী উৎসাহ", আমাদের মধ্যে এখনও তার বিলক্ষণ অভাব আছে। এই সাধারণী উৎসাহ ইংরাজদের মধ্যে প্রবল থাকাতে তাদের এত উন্নতি। হ—বাবু বল্‌ছিলেন, আমাদের শিক্ষিত লোকদের—বিশেষত চাক্‌রে শ্রেণীদের মধ্যে আর একটি দোষ আছে। যদিও বা কোন গতিকে তাঁরা একটা কারবার আরম্ভ করেন তাঁরা পদে পদে ভয় পান—তাঁরা মনে করেন "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী"—কারবার করে রাতারাতি যদি তাঁরা বড়মানুষ না হতে পারলেন তবে ও কথার সার্থকতা কি? তার একটু এদিক ওদিক হলেই গোলযোগ বেধে যায়। প্রথমে একটু ক্ষতি দেখলেই তাঁরা ভয় পান—তাঁদের আর অধ্যবসায় থাকে না—তাঁরা তাড়াতাড়ি কারবারটা উঠিয়ে দেন। কিন্তু আমাদের অশিক্ষিত মহাজন শ্রেণী এ বিষয়টা ভাল বুঝে। হ—বাবু বল্লেন, বরিশালে একজন মহাজনের কারবার ছিল। কারবারে এক সময়ে অনেক লহনা বাকি পড়ে। ধনী তাহাতে বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর যে গদিয়ান ছিল, সে বলিল, আরও কতক টাকা আপনাকে এই কারবারে দিতে হবে, তা হলে আমি শুধ্‌রাতে পারব। ধনী সাহস করে সেই টাকা দিলেন। এখন বরিশালের মধ্যে তাঁরই প্রধান দোকান। কারবার খুব ফলাও হয়ে উঠেছে। স—বাবুদের বেঙ্ক ফেল হওয়ায় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে একটা নৈরাশ্য উপস্থিত হয়েছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে জয়েণ্টষ্টক প্রণালীতে কোন কারবার হতে পারে না এইটে সকলের বিশ্বাস হয়ে পড়েছে। আসল কথা, কাজের ভাল বন্দবস্ত থাকলে বেঙ্কটা ফেল হত না। বাস্তবিক আমাদের সাহস ও অধ্যবসায় অত্যন্ত কম। আমরা বড়ই সাবধানী জাত। অতি-সাবধানটা ভাল নয়। ইংরাজেরা আমাদের বুঝে নিয়েছে। তুমি অবশ্য যান এখানে আমার যেমন জাহাজ চল্‌চে তেমনি ফ্লোটিলা কোম্পানি নামক একটি ইংরেজ কোম্পানির জাহাজ চল্‌চে। আমাদের উভয়ের মধ্যে খুব প্রতিদ্বন্দিতা চল্‌চে। ফ্লোটিলা কোম্পানির অনেক খরচপত্র লোকজনের ব্যয় কিন্তু তারা প্রায়ই যাত্রী পায় না। অধিকাংশ যাত্রী আমাদের জাহাজে যায়। তাদের বিস্তর ক্ষতি হচ্চে তবু তারা সমান নিয়মিত ভাবে জাহাজ চালাচ্চে—যত্নের একটু ত্রুটি কিম্বা শৈথিল্য করে না; আর, তারা প্রকাশ্যভাবে বলে—বাঙ্গালীর অধ্যবসায় নাই, তাহারা আমাদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করে কতদিন জাহাজ চালাতে পারবে। এখানে আমাদের জাহাজ যাতে

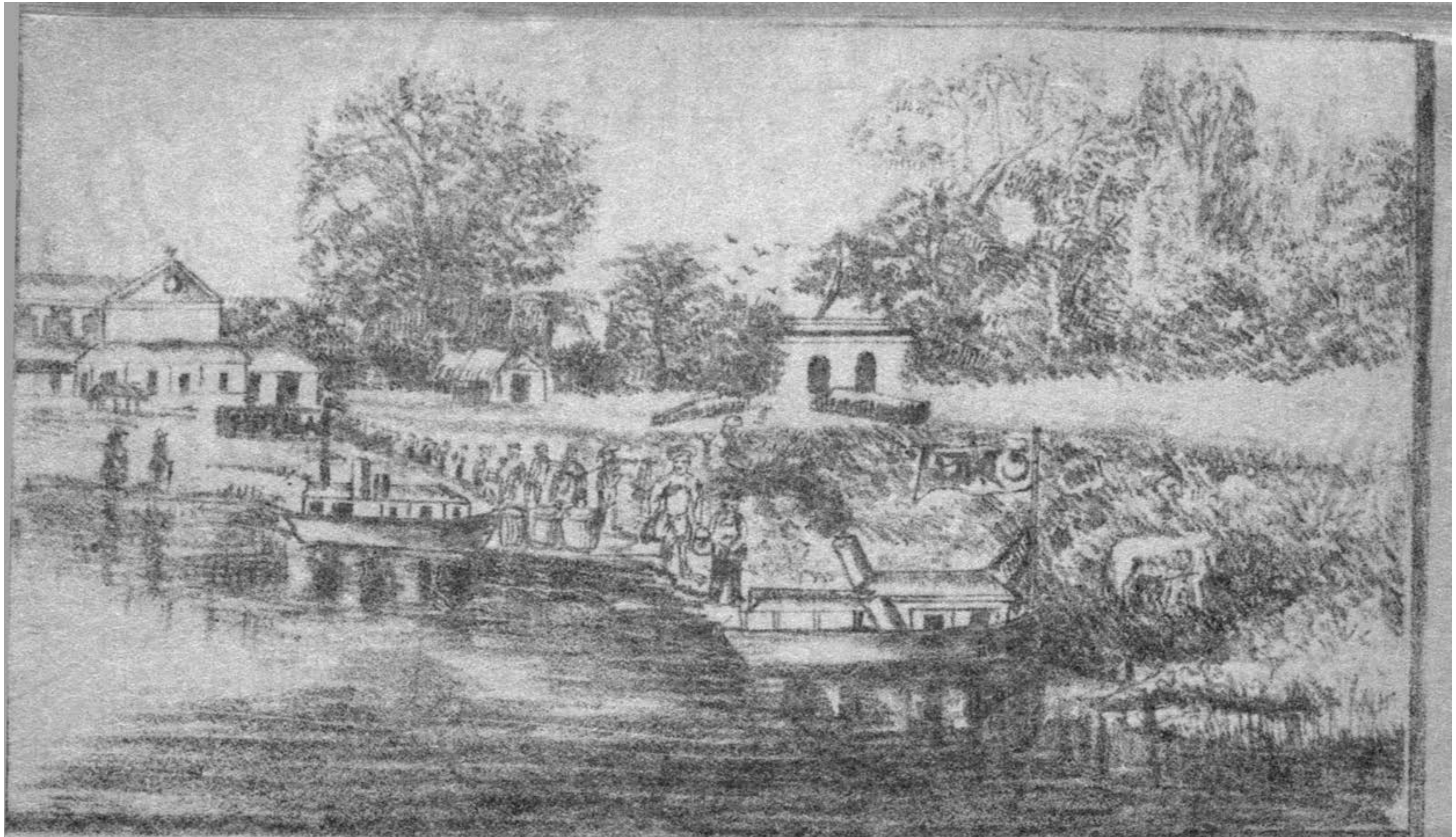

বরিশাল।

স্থায়ী হয় তার জন্য এখানকার লোকের—বিশেষতঃ ইস্কুলের ছাত্রদের অপরিসীম উৎসাহ ও যত্ন। এমন উৎসাহ আমি কখন দেখি নি। তাদের ভাব দেখে চমৎকৃত হতে হয়। প্রত্যহ খুব ভোরে আমাদের জাহাজ এখান থেকে যাত্রী নিয়ে খুলনায় যায়। ফ্লোটিলা কোম্পানীর জাহাজও সেই সময় যায়। পাছে আমাদের জাহাজে লোক না গিয়ে প্রতিপক্ষের জাহাজে যায় এই জন্য কতকগুলি ভদ্র লোক ও স্কুলের ছাত্র রাত্রি ৪ টার সময় উঠে দলবদ্ধ হয়ে উৎসাহের সহিত জাহাজের ঘাটে প্রত্যহ উপস্থিত হন ও যদি কোন যাত্রী প্রতিপক্ষের জাহাজে যেতে চায়, তাকে অনেক প্রকার বুঝিয়ে এমন কি পায়ে পর্য্যন্ত ধরে ফিরিয়ে আনেন। এমন কি, জালি বোটে করে প্রতিপক্ষের জাহাজে লোক উঠ্ছে—সেখান পর্য্যন্ত গিয়ে তাদের বুঝাতে থাকেন। "আমাদের কথাটি একবার শুনুন, তারপর যে জাহাজে ইচ্ছা হয় যাবেন। আপনারা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জাহাজ থাক্‌তে কেন আপনারা ইংরাজদিগের জাহাজে যাবেন? দেশের টাকা দেশে থাকে এটা কি প্রার্থনীয় নহে? প্রতিপক্ষের জাহাজে স্বদেশীয়দিগের প্রতি কুব্যবহার করা হত, অপমান করা হত—আমাদের নিমন্ত্রণেই, আমাদের আহ্বানেই ঠাকুর বাবুরা এখানে জাহাজ এনেছেন—তখন কি আপনার ও-জাহাজে যাওয়া উচিত?" "হাঁ বটে বা বল্লে তার উত্তর নাই, চল ঐ জাহাজে যাওয়া যাক্‌"—এই বলে যাত্রীরা আবার আমাদের জাহাজে অনেকে ফিরে আসেন। একটি বার বৎসর বয়স্ক বালক ঘাটে সে দিন বক্তৃতা দিয়েছিল। "হে ভাই সকল, তোমরা আপনার জাহাজ থাকতে পরের জাহাজে যাইবানা। উহাদের ঐ যে জাহাজ দেখিতেছ উহার যেরূপ গঠন তাহাতে একটু বেশি বাতাস উঠিলেই দোদুল্যমান হইয়া জলগর্ভে নিমগ্ন হইবে—তাহার সাক্ষী দেখ, উহারা এখানে জাহাজ রাখিতে পারে নাই—ওপারে লইয়া গিয়াছে—এবং এই বাতাসেই দোদুল্যমান হইতেছে—যদি তোমরা প্রাণ বাঁচাইতে চাও তো ভাই-সকল ঐ জাহাজে যাইবা না"—এই কথা শুনে নীচশ্রেণী লোকদের ভয় হল—আর প্রতিপক্ষের জাহাজে তারা গেল না। ঝড় হোক্—বৃষ্টি হোক্—রৌদ্র হোক্—যে কোন বাধা হোক্ কিছুই না মেনে তাঁহারা জাহাজের সিটি (বাঁশির ডাক) শুনবামাত্র দৌড়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তাঁহারা বলেন আমাদের জাহাজের সিটি তাঁহাদের এমন মিষ্টি লাগে ও তাহা শুনতে পেলে তাঁদের এমন আহ্লাদ হয় যে তাহা বলবার নয়। বন্ধুদের সুপরিচিত গলার স্বর দূর হতে শুনলে যেমন বুঝা যায় কে আসছে তেম্‌নি সিটি শুনলেই কোন্ জাহাজ আসচে তাঁরা বুঝ্‌তে পারেন। ঐ আজ "ভারত" আস্‌ছে, ঐ আজ "লডরিপন আস্‌ছে" "ঐ আজ বঙ্গলক্ষ্মী আস্‌ছে"—ঐ আজ "স্বদেশী" আস্‌ছে" এই বলে সকলে উৎসাহের সহিত হাস্যমুখে দলবদ্ধ হয়ে ঘাটে এসে উপস্থিত হন। সে দিন একজন বল্‌ছিলেন, "যেমন বৃন্দাবনের কৃষ্ণের বংশিধ্বনিতে হৃদয় আকৃষ্ট হত, সেইরূপ তাঁদেরও হৃদয় আকৃষ্ট হয়"। আবার প্রতিপক্ষের জাহাজের নাম পর্য্যন্ত তাঁরা

সইতে পারেন না—তার সিটিও তাঁদের কানে অত্যন্ত কর্কশ লাগে। প্রতিপক্ষের জাহাজ যদি কোন দিন যাত্রী পায় সে দিন তাঁদের আপ্‌সোসের আর সীমা থাকে না।

সে দিন আমাকে অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য এখানে যে একটি বৃহৎ সভা হয়েছিল, তাতে একটি বক্তা আমার ষ্টিমারের উল্লেখ কর্‌তে কর্‌তে হঠাৎ আপনাকে সম্বরণ করে বল্লেন—"তাঁর ষ্টীমার ভুলক্রমে বলেছি—ইহা তো আমাদেরই ষ্টীমার"—এই কথাটি আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। সে দিন সে সভায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলেন—একটি প্রকাণ্ড গৃহ লোকে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানকার হাকিম, উকীল জমিদার দোকান্দার মহাজন অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এখানকার প্রধান জমীদার শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। অনেকগুলি সুবক্তা সেদিন বক্তৃতা করেছিলেন। সে দিন ছাত্রদিগের আহ্লাদ ও উৎসাহের সীমা ছিল না। তারা আপনারাই সভার বিজ্ঞাপন ঘরে ঘরে গিয়ে বণ্টন করেছিল, গাছের পাতা দিয়ে ঘরটি সুন্দর সাজিয়েছিল। তাদের উৎসাহ দেখলে নিরাশ প্রাণেও আশার সঞ্চার হয়—নিরুদ্যম হৃদয়েও উদ্যমের ভাব আসে।

সে দিন এখানে জাতীয় সংকীর্ত্তন হয়েছিল। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" অঙ্কিত নিশান হাতে নিয়ে, খোল কর্ত্তাল বাজাতে বাজাতে, বাহু তুলে, উৎসাহের সহিত গান করতে করতে সংকীর্ত্তনের দল রা—বাবুর বাড়ি থেকে বৈকালে বেরুলেন—যেতে যেতে রাস্তার লোকের ভীড় বাড়তে লাগ্‌ল—তারপর বাজারে পৌছিলে লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌ল। প্রথমে লোকেরা মনে করেছিল, বুঝি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংকীর্ত্তন, তাই অ—বাবু একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে এ কীর্ত্তনের উদ্দেশ্য অল্প কথায় ও সহজ ভাষায় বেশ বুঝিয়ে দিলেন—তাতে লোকেরা বেশ বুঝ্‌তে পারলে ও উৎসাহের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে সবাই যোগ দিলে।

নগর সংকীর্ত্তনের যে কি মাতানে ভাব আমি সে দিন বেশ বুঝতে পারলেম—এইরূপ জাতীয় সংকীর্ত্তন যদি নগরে নগরে গ্রামে গাওয়া হয় তাহলে বড়ই উপকার হয়। সাধারণের মধ্যে জাতীয়ভাব প্রচারের ভাল উপায় এর চেয়ে আর কিছুই নেই। যে গানটা গাওয়া হয়েছিল, সেটা নিয়ে প্রকাশ করা গেল। এই গানটায় লোকে যে কি রকম মেতে উঠেছিল, সুর না শুন্‌লে শুধু কথায় বোঝা যাবে না। যাইহোক্, তবু কতকটা তার বুঝ্‌তে পারবে।

কে কোথায় আছিস্ ভাই, আয়রে সকলে গাই,
প্রাণের সঙ্গীত আজি কাঁপায়ে গগণ।
বেঁধে আজি প্রাণে প্রাণে, শত কণ্ঠে একতানে,
সবে মিলে গাই গীত মৃত সঞ্জীবন।

একতালা।

(ও ভাই) দেখ সব্ ঘুমিয়ে, অচেতন হয়ে,
দেশের দশা একবার, করেনা স্মরণ।
[একবার চায়নারে কেউ নয়ন মেলে]
(একিরে কাল নিদ্রা এল)
(মোরা) সবারে জাগাব, দুর্দ্দশা ঘুচাব,
নিদ্রাগত প্রাণে, আনিব চেতন।
[এঘোর দুঃখ নিশি অবসানে]
(মহারাণীর সুশাসনে)
(ও ভাই) ভিন্ন ভিন্ন জাতি, মিলে দিবা রাতি,
ভাই ভাই হয়ে, করিব সাধন।
[মিলে প্রেমসূত্রে প্রাণে প্রাণে]
দেখ্‌বে দেশে দেশে, এ ভারতে মিশে,
কত জাতির হল, প্রেমেতে মিলন।
[ওরে এমন শোভা দেখ্‌বে কোথা]

রূপক।

আহা, জননী জন্মভূমি, স্বর্গাদপি গরীয়সী,
ভাবে মেতে কোটী কণ্ঠে কর্ উচ্চারণ।

মনরসই—একতালা।

শত্রু মিত্র মিলে, ঘরের বিবাদ ভুলে,
গলাগলি হয়ে গাইরে।
(আজি) দেশের কাজে মোরা, হয়ে মাতোয়ারা,
স্বার্থের কথা ভুলে যাইরে।
[দেশের প্রেমে মত্ত হয়ে]
(মায়ের চরণ সেবায়)
(করি) হয়ে এক মন, মায়েরই কীর্ত্তন,
(মোরা) পঁচিশ কোটী প্রাণী ভাইরে।
বিংশতি জাতিতে, বিংশতি ভাষাতে,
মেদিনী কাঁপায়ে গাইরে।
[জয় ভারত জননী ব'লে]
(সমস্বরে সবে)

খাম্বাজ—কওয়ালী।

একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটী মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।
আমরা ডরাইবনা ঝটিকা ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে ত টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন।
তাহলে আসুক বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়।

রূপক।

নব উদ্যম দেখিয়ে সবে, চমকিত হয়ে ক'বে
বুঝি ভারত হবে আবার, জগত ভূষণ।

ঝুলন।

(ওরে) চারিদিকে সবাই জেগে তোরাই ঘুমে রলি
শুধু তোরাই ঘুমে রলি, ছিছি, তোরাই ঘুমে রলি।
নবীন আলোয় হাস্‌ছে ধরা দেখ্‌রে নয়ন মেলি।
(চেয়ে দেখ্ দেখ্‌রে ও ভাই)
ছিছি, কাজের বেলা ভোরের বেলা ঘুমে বিভোর হলি!
[জেগে আয় আয়রে ভাই]
(ওরে এমন দিন আর পাবি নারে)
হায়রে ঘুমের ঘোরে বুঝ্‌লি নারে কি ছিলি কি হলি।
(একবার ভেবে দেখ্‌রে ওভাই)
ছিছি এতকাল ঘুমিয়ে আছিস্ তবু না জাগিলি।
(একি হ'লরে ভাই)
হায়রে জেগেও বুঝি জাগলি নারে, কেন এমন হলি।
(একবার উঠ উঠ সবে)
এস মহা নিদ্রা ভেঙ্গে করি কোলাকুলি!
(জয় ভারত বলেরে ভাই)
এস দলাদলির বাঁধন খুলে বাঁধি গলাগলি।
(ভারত মাতার নিশান তুলে)
(আর দেরি করিস্ নারে)
(একবার আয় আয়রে সবে)

রূপক।

সবে এক প্রাণ হয়ে, ভগবানের নামটী লয়ে,
দেশের মঙ্গল সাধনে, কর প্রাণপণ।

হাসিরাশি।

তার নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী,
একরত্তি মেয়ে।
হাসিখুসি চাঁদের আলো
মুখটি আছে ছেয়ে।
ফুট্‌ফুটে তার দাঁত ক'খানি
পুট্‌পুটে তার ঠোঁট।
মুখের মধ্যে কথাগুলি সব্‌
উলোট্ পালোট্।
কচি কচি হাত দুখানি,
কচি কচি মুঠি,
মুখ্‌নেড়ে কেউ কথা ক'লে
হেসেই কুটি কুটি।
তাই তাই তাই তালি দিয়ে
দুলে দুলে নড়ে,
চুলগুলি সব কালো কালো
মুখে এসে পড়ে।
"চলি—চলি—পা—পা—"
টলি টলি যায়,

গরবিনী হেসে হেসে
আড়ে আড়ে চায়।
হাতটি তুলে চুড়ি দু-গাছি
দেখায় যাকে তাকে,
হাসির সঙ্গে নেচে নেচে
নোলক দোলে নাকে।
রাঙা দুটি ঠোঁটের কাছে
মুক্ত' আছে ফোলে,'
মায়ের চুমোখানি যেন
মুক্ত' হ'য়ে দোলে!
আকাশেতে চাঁদ দেখেছে
দুহাত তুলে চায়,
মায়ের কোলে দুলে দুলে
ডাকে আয় আয়।
চাঁদের আঁখি জুড়িয়ে গেল
তার মুখেতে চেয়ে,
চাঁদ ভাবে কোথেকে এল
চাঁদের মত মেয়ে!
কচি প্রাণের হাসিখানি,
চাঁদের পানে ছোটে,
চাঁদের মুখের হাসি, আরো
বেশী ফুটে ওঠে।
এমন সাধের ডাক শুনে, চাঁদ
কেমন ক'রে আছে,
তারাগুলি ফেলে বুঝি
নেমে আস্‌বে কাছে!
সুধা মুখের হাসিখানি
চুরি করে নিয়ে,
রাতারাতি পালিয়ে যাবে
মেঘের আড়াল দিয়ে।
আমরা তারে রাখ্‌ব ধ'রে
রাণীর পাশেতে।
হাসি রাশি বাঁধা রবে
হাসি রাশিতে।

LITHO BY H.C. HALDER

মুখ চেনা।

ভুরু।

ভুরুর যোগে চোখে নানা প্রকার ভাব প্রকাশ হয়—এই জন্য ভুরুর বিষয় এখা একটু বলা আবশ্যক।

নানা রকমের ভুরু সচরাচর দেখা যায়। কারও ভুরু ঘন, কারও সরু, কা সূক্ষ্ম কারও স্থূল, কারও মসৃণ কারও কর্কশ, কারও সোজা কারও ধনুকের বাঁকা, কারও বা ভুরু টেড়া ভাবে কতকদূর উঠিয়া আবার ঢালু হইয়া নাবিয়াছে।

সাধারণতঃ বাঁকা ভুরুতে মেয়েলি ভাব ও সোজা ভুরুতে পুরুষ-চরিত্রের লক্ষণ প্র পায়। বাঁকা ভুরু, সোজা ভুরু অপেক্ষা দেখিতে সুন্দর। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বে ভাগ বাঁকা ভুরু দেখা যায়।

যদি ভুরু ধনুকের মত খুব বাঁকা হয় এবং যাহার ঐরূপ ভুরু সে যদি ঘন ঘন কুঞ্চি করিয়া উপর দিকে উঠায়, তাহা হইলে এই প্রকাশ পায় যে সে ব্যক্তি, গর্ব্বিত, ভাবু অত্যাকাঙ্ক্ষী, সৌন্দর্য্যানুরাগী, ও সে খুব জাঁকজমক ভাল বাসে।

নীচু, বাহিরদিকে ঝোঁকা, বারগুা-বেরকরা ভুরুতে বিচার-শক্তি, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা, চিন্তার গভীরতা, ও গবেষণা শক্তি বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ডারুইন, গ্লাডষ্টোন্, সর উইল্ ফ্রিড্ লসন্—লিবিংষ্টন প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোকদিগের এইরূপ ভুরু।

ভুরু চোখের কাছাকাছি থাকিলে, চরিত্রের দৃঢ়তা, গভীরতা, একনিষ্ঠতা প্রকাশ পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি দেখ।

আর, চোখ হইতে ভুরু যার যত উর্দ্ধে থাকে সেই পরিমাণে তার চপলতা, উদ্যম-অধ্যবসায়ের অভাব প্রকাশ পায়।

যাদের ভুরু খুব পাতলা ও চোখ হইতে দূরে তাদের হৃদয়ের আগ্রহ ও শক্তি কম। যাদের এইরূপ ভুরু তারা কখনই দৃঢ়মনস্ক, সূক্ষ্মবুদ্ধি, উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন, কিম্বা গভীর চিন্তাশীল হয় না।

সূক্ষ্ম ও সমান ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার ঐরূপ ভুরু তাহার মন উচ্চ ভাবা-পন্ন, বাহ্য বিষয়ের ভাব সহজে ও শীঘ্র তাহার মনে অঙ্কিত হয়—বুদ্ধি পরিষ্কার, ও চরিত্রে সামঞ্জস্য ভাব আছে। ভুরু সূক্ষ্ম অথচ অসমান হইলে, বিরক্তি-প্রবণতা ও উত্তে-জনশীলতা প্রকাশ পায়।

ঘন ও খুব স্পষ্টব্যক্ত ভুরুতে এই প্রকাশ পায় যে যাহার এইরূপ ভুরু তাহার শরীরের অস্থি ও মাংসপেশীর প্রাবল্য আছে—তাহার চরিত্রের বল ও সহিষ্ণুতা আছে—অধ্যব-সায়, মনের আগ্রহ, এবং বাধাবিঘ্নের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতা আছে।

এই প্রকার ভ্রু আবার যদি কর্কশ হয়, স্থূল হয়, অসমান হয়, তাহা হইলে ইহাতে চরিত্রের অসামঞ্জস্য, হৃদয়ের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। ভ্রূযুগল পরস্পর হইতে খানিকটা ছাড়াছাড়ি করিয়া থাকিলে ইহাই প্রকাশ করে যে যাহার ঐরূপ রু তাহার হৃদয়ভাবের খুব তীব্রতা আছে—তাহাদের ইন্দ্রিয়বোধ খুব দ্রুতগামী এবং হ্য বিষয়ের ভাব তাহাদের মনে শীঘ্র অঙ্কিত হয়।

রাজর্ষি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভুবনেশ্বরী দেবীমন্দিরের ভৃত্য জয়সিংহ জাতিতে রাজপুত, ক্ষত্রিয়। তাঁহার বাপ ৎ সিং ত্রিপুরার রাজবাটির একজন পুরাতন ভৃত্য ছিলেন। সুচেৎ সিংহের মৃত্যু-ল জয় সিংহ নিতান্ত বালক ছিলেন। এই অনাথ বালককে রাজা মন্দিরের কাজে যুক্ত করেন। জয়সিংহ মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির দ্বারাই পালিত ও শিক্ষিত ইয়াছেন। ছেলেবেলা হইতে মন্দিরে পালিত হইয়া জয়সিংহ মন্দিরকে গৃহের মত লা বাসিতেন, মন্দিরের প্রত্যেক সোপান, প্রত্যেক প্রস্তর-খণ্ডের সহিত তাঁহার পরি-র ছিল। তাঁহার মা ছিল না, ভুবনেশ্বরী প্রতিমাকেই তিনি মায়ের মত দেখিতেন, তিমার সম্মুখে বসিয়া তিনি কথা কহিতেন, তাঁহার একলা বোধ হইত না। তাঁহার রিও সঙ্গী ছিল। মন্দিরের বাগানের অনেকগুলি গাছকে তিনি নিজের হাতে মানুষ রিয়াছেন। তাঁহার চারিদিকে প্রতিদিন তাঁহার গাছগুলি বাড়িতেছে, লতাগুলি ড়াইতেছে, শাখা পুষ্পিত হইতেছে, ছায়া বিস্তৃত হইতেছে, শ্যামল পল্লবস্তবকে গৌরবগর্ব্বে নিকুঞ্জ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু জয়সিংহের এ সকল প্রাণের থা, ভালবাসার কথা বড় একটা কেহ জানিত না; তাঁহার বিপুল বল ও সাহসের জন্যই তিনি বিখ্যাত ছিলেন।

মন্দিরের কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া জয়সিংহ তাঁহার কুটীরের দ্বারে বসিয়া আছেন। সুমুখে মন্দিরের কানন। বিকাল হইয়া আসিয়াছে। অত্যন্ত ঘন মেঘ করিয়া বৃষ্টি হই-তেছে। নব বর্ষার জলে জয়সিংহের গাছগুলি স্নান করিতেছে, বৃষ্টি বিন্দুর নৃত্যে পাতায় পাতায় উৎসব পড়িয়া গিয়াছে, বর্ষাজলের ছোট ছোট শত শত প্রবাহ ঘোলা হইয়া কল্‌কল্‌ করিয়া গোমতী নদীতে গিয়া পড়িতেছে—জয়সিংহ পরমানন্দে তাঁহার কানের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। চারিদিকে মেঘের স্নিগ্ধ অন্ধকার,

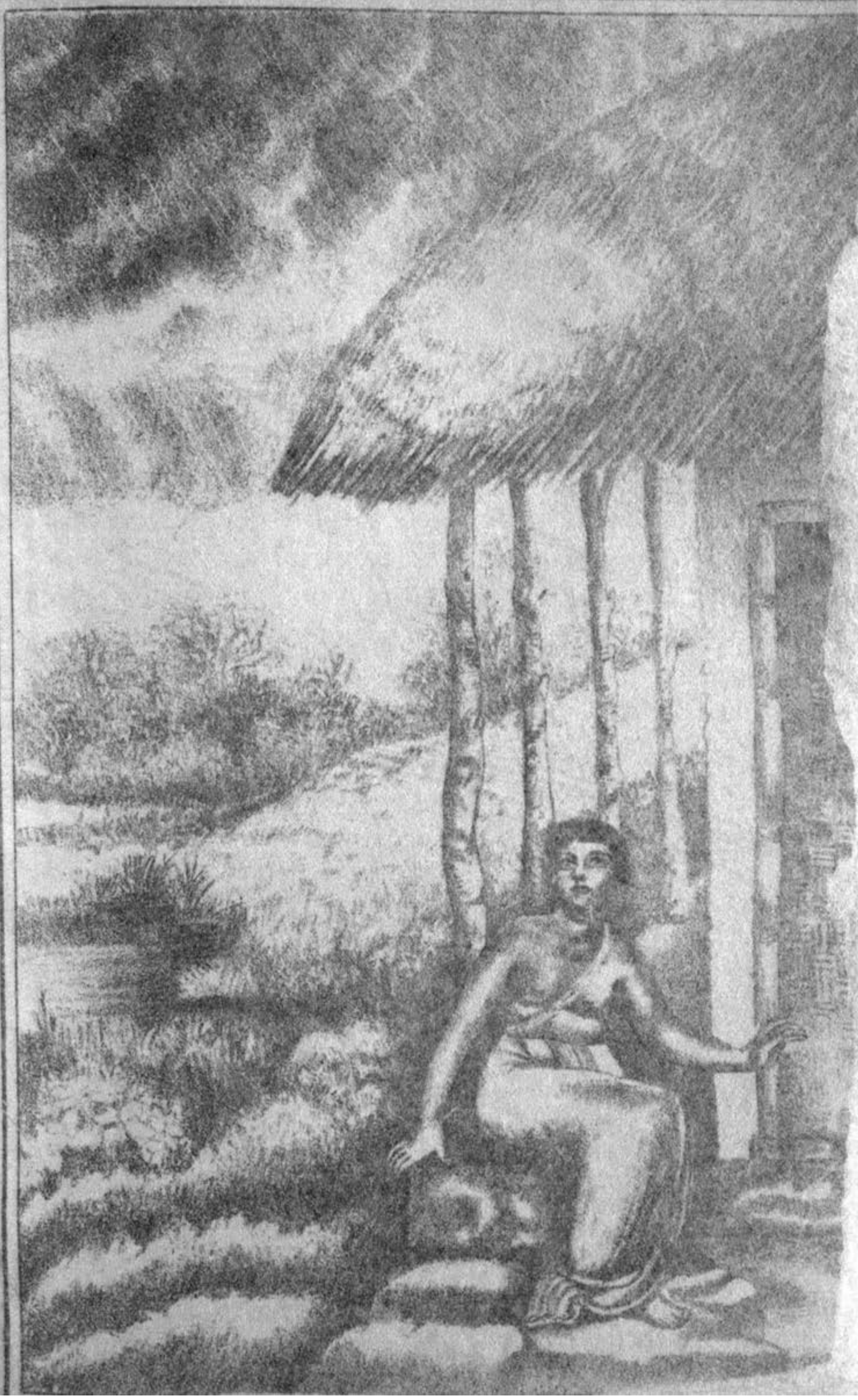

বনের ছায়া, ঘন পল্লবের শ্যামশ্রী, ভেকের কোলাহল, বৃষ্টির অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ—কাননের মধ্যে এইরূপ নববর্ষার ঘোরঘটা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ জুড়াইয়া যাইতেছে।

ভিজিতে ভিজিতে রঘুপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জয়সিং তাড়াতাড়ি উঠিয়া পা ধুইবার জল ও শুক্‌ন কাপড় আনিয়া দিলেন। রঘুপতি বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমাকে কাপড় আনিতে কে কহিল?" বলিয়া কাপড়গুলা লইয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। জয়সিং পা ধুইবার জল লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুপতি বিরক্তির স্বরে কহিলেন—"থাক্ থাক্, তোমার ও জল রাখিয়া দাও!" বলিয়া পা দিয়া জলের ঘ. ঠেলিয়া ফেলিলেন। জয়সিং সহসা এরূপ ব্যবহারের কারণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইলেন—কাপড় ভূমি হইতে তুলিয়া যথাস্থানে রাখিতে উদ্যত হইলেন—রঘুপতি পুনশ্চ বিরক্তভাবে কহিলেন—"থাক্ থাক্, ও কাপড়ে তোমার হাত দিতে হইবে না।" বলিয়া, নিজে গিয়া কাপড় ছাড়িয়া আসিলেন। জল লইয়া পা ধুইলেন। জয়সিংহ ধীরে ধীরে কহিলেন "প্রভু আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি?" রঘুপতি কিঞ্চিৎ উগ্রস্বরে কহিলেন "কে বলিতেছে যে তুমি অপরাধ করিয়াছ!" জয়সিংহ ব্যথিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। রঘুপতি অস্থির ভাবে কুটীরের দাওয়ায় বেড়াইতে লাগিলেন। এই রূপে রাত্রি অনেক হইল; ক্রমাগত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। অবশেষে রঘুপতি জয়সিংহের পিঠে হাত দিয়া কোমলস্বরে কহিলেন, "বৎস শয়ন করিতে যাও, রাত্রি অনেক হইল।" জয়সিং রঘুপতির স্নেহের স্বরে বিচলিত হইয়া কহিলেন "প্রভু আগে শয়ন করিতে যান তার পরে আমি যাইব।" রঘুপতি কহিলেন "আমার বিলম্ব আছে। দেখ পুত্র, তোমার প্রতি আমি আজ কঠোর ব্যবহার করিয়াছি, কিছু মনে করিও না। আমার মন ভাল ছিল না। সবিশেষ বৃত্তান্ত তোমাকে কাল প্রভাতে বলিব। আজ তুমি শয়ন কর'গে।" জয়সিং কহিলেন "যে আজ্ঞে!" বলিয়া শয়ন করিতে গেলেন। রঘুপতি সমস্ত রাত বেড়াইতে লাগিলেন।

প্রভাতে জয়সিং গুরুকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুপতি কহিলেন "জয়সিং, মায়ের বলি বন্ধ হইয়াছে।" জয়সিং বিস্মিত হইয়া কহিলেন—"সে কি কথা প্রভু?"

রঘুপতি—"রাজার এইরূপ আদেশ।"

জয়সিং—"কোন রাজার।"

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "এখানে রাজা আবার কয়গণ্ডা আছে? মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য আদেশ করিয়াছেন মন্দিরে জীব-বলি হইতে পারিবে না।"

জয়সিং—"নর বলি?"

রঘুপতি—"আঃ, কি উৎপাত! আমি বলিতেছি জীব বলি, তুমি শুনিতেছ নরবলি!"

জয়সিং—"কোন জীব বলিই হইতে পারিবে না!"

রঘুপতি। "না।"

জয়সিং। "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন"?

রঘুপতি। "হাঁ গো, এক কথা কতবার বলিব!"

জয়সিং অনেকক্ষণ কিছুই বলিলেন না, কেবল আপন মনে বলিতে লাগিলেন "মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য!" গোবিন্দমাণিক্যকে জয়সিং ছেলেবেলা হইতে দেবতা বলিয়া জানিতেন। আকাশের পূর্ণচন্দ্রের প্রতি শিশুদের যেমন একপ্রকার আসক্তি আছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি জয়সিংহের সেইরূপ মনের ভাব ছিল। গোবিন্দমাণিক্যের প্রশান্ত সুন্দর মুখ দেখিয়া জয়সিং প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারিতেন।

রঘুপতি কহিলেন—"ইহার একটাত প্রতিবিধান করিতে হইবে!"

জয়সিংহ কহিলেন—"তা অবশ্য। আমি মহারাজের কাছে যাই, তাঁহাকে মিনতি করিয়া বলি—"

রঘুপতি—"সে বৃথা চেষ্টা।"

জয়সিংহ—"তবে কি করিতে হইবে।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন "সে কাল বলিব। কাল তুমি প্রভাতে কুমার নক্ষত্রমাণিক্যের নিকটে গিয়া তাঁহাকে গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিবে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে নক্ষত্রমাণিক্য আসিয়া রঘুপতিকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর কি আদেশ করেন?"

রঘুপতি কহিলেন "তোমার প্রতি মায়ের আদেশ আছে। আগে মাকে প্রণাম করিবে চল।"

উভয়ে মন্দিরে গেলেন। জয়সিংহও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। নক্ষত্রমাণিক্য ভুবনেশ্বরী প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

রঘুপতি নক্ষত্রমাণিক্যকে কহিলেন "কুমার, তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "আমি রাজা হইব? ঠাকুরমশায় যে কি বলেন তার ঠিক নাই।" বলিয়া নক্ষত্রমাণিক্য অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি বলিতেছি তুমি রাজা হইবে।"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "আপনি বলিতেছেন আমি রাজা হইব?" বলিয়া রঘুপতির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

রঘুপতি কহিলেন "আমি কি মিথ্যা কথা বলিতেছি?"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "আপনি কি মিথ্যা কথা বলিতেছেন, সে কেমন করিয়া

হইবে? দেখুন ঠাকুর মশায় আমি কাল ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিয়াছি। আচ্ছা ব্যাঙের স্বপ্ন দেখিলে কি হয় বলুন দেখি!"

রঘুপতি হাস্য সম্বরণ করিয়া কহিলেন "কেমনতর ব্যাং বল দেখি? তাহার মাথায় দাগ আছে ত?"

নক্ষত্র সগর্ব্বে কহিলেন "তাহার মাথায় দাগ আছে বৈ কি। দাগ না থাকিলে চলিবে কেন?"

রঘুপতি কহিলেন "বটে! তবে ত তোমার রাজটীকা লাভ হইবে!"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "তবে আমার রাজটীকা লাভ হইবে! আপনি বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে? আর যদি না হয়?"

রঘুপতি কহিলেন "আমার কথা ব্যর্থ হইবে? বল কি!"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "না না সে কথা হইতেছে না। আপনি কি না বলিতেছেন আমার রাজটীকা লাভ হইবে, মনে করুন যদিই না হয়! দৈবাৎ কি এমন হয় না যে—"

রঘুপতি কহিলেন "না না, ইহার অন্যথা হইবে না।"

নক্ষত্রমাণিক্য "ইহার অন্যথা হইবে না। আপনি বলিতেছেন ইহার অন্যথা হইবে না। দেখুন ঠাকুর মশায়, আমি রাজা হইলে আপনাকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি "মন্ত্রিত্বের পদে আমি পদাঘাত করি।"

নক্ষত্রমাণিক্য অত্যন্ত উদার ভাবে কহিলেন "আচ্ছা জয়সিংকে মন্ত্রী করিব।"

রঘুপতি কহিলেন "সে কথা পরে হইবে। রাজা হইবার আগে কি করিতে হইবে সেটা শোন আগে। মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আমার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে।"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "মা রাজরক্ত দেখিতে চান, স্বপ্নে আপনার প্রতি এই আদেশ হইয়াছে। এ ত বেশ কথা!"

রঘুপতি কহিলেন "তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত আনিতে হইবে।"

নক্ষত্রমাণিক্য খানিকটা হাঁ করিয়া রহিলেন। এ কথাটা তত "বেশ" বলিয়া মনে হইল না।

রঘুপতি তীব্রস্বরে কহিলেন "সহসা ভ্রাতৃস্নেহের উদয় হইল না কি?"

নক্ষত্রমাণিক্য কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন "হাঃ, হাঃ, ভ্রাতৃস্নেহ! ঠাকুর মহাশয় বেশ বলিলেন যাহোক্, ভ্রাতৃস্নেহ!"—এমন মজার কথা এমন হাসিবার কথা যেন আর হয় না! ভ্রাতৃস্নেহ! কি লজ্জার বিষয়! কিন্তু অন্তর্যামী জানেন নক্ষত্রমাণিক্যের প্রাণের ভিতরে ভ্রাতৃস্নেহ জাগিতেছে, তাহা হাসিয়া উড়াইবার যো নাই।

রঘুপতি কহিলেন "তা হইলে কি করিবে বল।"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "কি করিব বলুন!"

রঘুপতি—"কথাটা ভাল করিয়া শোন। তোমাকে গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

নক্ষত্রমাণিক্য মন্ত্রের মত বলিয়া গেলেন—"গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত মায়ের দর্শনার্থ আনিতে হইবে।"

রঘুপতি নিতান্ত ঘৃণার সহিত বলিয়া উঠিলেন—"নাঃ, তোমার দ্বারা কিছু হইবে না।"

নক্ষত্রমাণিক্য কহিলেন "কেন হইবে না? যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। আপনি ত আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি—"হাঁ, আমি আদেশ করিতেছি।"

নক্ষত্রমাণিক্য—"কি আদেশ করিতেছেন?"

রঘুপতি বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মায়ের ইচ্ছা তিনি রাজরক্ত দর্শন করিবেন। তুমি গোবিন্দমাণিক্যের রক্ত দেখাইয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবে এই আমার আদেশ।"

নক্ষত্রমাণিক্য—"আমি আজই গিয়া কতের্থাকে এই কাজে নিযুক্ত করিব।"

রঘুপতি—"না না, আর কোন লোককে ইহার বিন্দু বিসর্গ জানাইও না। কেবল জয়সিংহকে তোমার সাহায্যে নিযুক্ত করিব। কাল প্রাতে আসিও, কি উপায়ে এ কার্য্য সাধন করিতে হইবে কাল বলিব।"

নক্ষত্রমাণিক্য রঘুপতির হাত এড়াইয়া বাঁচিলেন। যত শীঘ্র পারিলেন বাহির হইয়া গেলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নক্ষত্রমাণিক্য চলিয়া গেলে জয়সিংহ কহিলেন "গুরুদেব, এমন ভয়ানক কথা কখন শুনি নাই। আপনি মায়ের সম্মুখে মায়ের নাম করিয়া ভাইকে দিয়া ভ্রাতৃহত্যার প্রস্তাব করিলেন আর আমাকে তাহা দাঁড়াইয়া শুনিতে হইল!"

রঘুপতি বলিলেন "আর কি উপায় আছে বল!"

জয়সিং কহিলেন—"উপায়!—কিসের উপায়!"

রঘুপতি—"তুমিও যে নক্ষত্রমাণিক্যের মত হইলে দেখিতেছি! এতক্ষণ তবে কি শুনিলে!"

জয়সিং—"যাহা শুনিলাম তাহা শুনিবার যোগ্য নহে, তাহা শুনিলে পাপ আছে!"

রঘুপতি—"পাপ পুণ্যের তুমি কি বুঝ?"

জয়সিং—"এতকাল আপনার কাছে শিক্ষা পাইলাম পাপ পুণ্যের কিছুই বুঝি না কি?"

রঘুপতি—"শোন বৎস, তোমাকে তবে আর এক শিক্ষা দিই। পাপ পুণ্য কিছুই

নাই! কেই বা পিতা, কেই বা ভ্রাতা, কেই বা কে! হত্যা যদি পাপ হয় ত সকল হত্যাই সমান। কিন্তু কে বলে হত্যা পাপ! কত পিপীলিকা আমরা প্রত্যহ পদতলে দলন করিয়া যাইতেছি, আমরা তাহাদের অপেক্ষা এম্নিই কি বড়! হত্যা ত প্রতিদিনই হইতেছে। কেহ বা মাথায় একখণ্ড পাথর পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা বন্যায় ভাসিয়া গিয়া হত হইতেছে, কেহ বা মড়কের মুখে পড়িয়া হত হইতেছে, কেহ বা মনুষ্যের ছুরিকাঘাতে হত হইতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীদের জীবন মৃত্যু খেলা বই ত নয়—মহাশক্তির মায়া বৈ ত নয়। কাল রূপিনী মহামায়ার নিকটে প্রতিদিন এমন কত লক্ষ কোটি প্রাণীর বলিদান হইতেছে—জগতের চতুর্দ্দিক হইতে জীবশোণিতের স্রোত তাঁহার মহাখর্পরে আসিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে—আমিই না হয় সেই স্রোতে আরেকটি কণা যোগ করিয়া দিলাম। তাঁহার বলি তিনিই এককালে গ্রহণ করিতেন, আমি না হয় মাঝখানে থাকিয়া উপলক্ষ্য হইলাম।"

তখন জয়সিংহ প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিতে লাগিলেন "এই জন্যই কি তোকে সকলে মা বলে, মা! তুই এমন পাষাণী! রাক্ষসি, সমস্ত জগৎ হইতে রক্ত নিষ্পেষণ করিয়া লইয়া উদরে পূরিবার জন্য তুই ঐ লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছিস! স্নেহ প্রেম মমতা সৌন্দর্য্য ধর্ম্ম সমস্তই মিথ্যা, সত্য কেবল তোর ঐ অনন্ত রক্ততৃষা! তোরই উদরপূরণের জন্য মানুষ মানুষের গলায় ছুরি বসাইবে, ভাই ভাইকে খুন করিবে, পিতা পুত্রে কাটাকাটি করিবে! নিষ্ঠুর, সত্য সত্যই এই যদি তোর ইচ্ছা তবে মেঘ রক্তবর্ষণ করে না কেন, করুণা স্বরূপিনী নদী রক্তস্রোত লইয়া রক্ত সমুদ্রে গিয়া পড়েনা কেন? তবে কেন এ জগতে কেবল মাত্র হিংসা দ্বেষ মারী ও বিভীষিকার রাজত্ব হইল না?—না না মা, তুই প্রকাশ করিয়া বল্—এ শিক্ষা মিথ্যা, এ শাস্ত্র মিথ্যা—আমার মাকে মা বলে না সন্তানরক্তপিপাসু রাক্ষসী বলে—এ কথা আমি সহিতে পারিব না!" জয়সিংহের চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তিনি নিজের কথা লইয়া নিজে ভাবিতে লাগিলেন। এত কথা ইতিপূর্ব্বে কখন তাঁহার মনে হয় নাই, রঘুপতি যদি তাঁহাকে নূতন শাস্ত্র শিক্ষা দিতে না আসিতেন তবে কখনই তাঁহার এত কথা মনেই আসিত না।

রঘুপতি ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "তবে ত বলিদানের পালা একবারে উঠাইয়া দিতে হয়!"

জয়সিংহ অতি শৈশব কাল হইতে প্রতিদিন বলিদান দেখিয়া আসিতেছেন এই জন্য মন্দিরে যে বলিদান কোন কালে বন্ধ হইতে পারে কিম্বা বন্ধ হওয়া উচিত এ কথা কিছুতেই তাঁহার মনে লাগে না। এমন কি এ কথা মনে করিতে তাঁহার হৃদয়ে আঘাত লাগে এই জন্য রঘুপতির কথার উত্তরে জয়সিং কহিলেন "সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার অন্য কোন অর্থ আছে। তাহাতে ত কোন পাপ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ভাইকে ভাই

হ্যা করিবে! তাই বলিয়া মহারাজ গোবিন্দমাণিক্যকে—প্রভু, আপনার পায়ে ধরিয়া জ্ঞাসা করি, আমাকে প্রবঞ্চনা করিবেন না, সত্যই কি মা স্বপ্নে কহিয়াছেন—রাজরক্ত নহিলে তাঁর তৃপ্তি হইবে না?"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন—"সত্য নহিলে কি মিথ্যা কহিতেছি? মি কি আমাকে অবিশ্বাস কর?"

জয় সিংহ রঘুপতির পদধূলি লইয়া কহিলেন—"গুরুদেবের প্রতি আমার বিশ্বাস শিথিল না হয় যেন! কিন্তু নক্ষত্রমাণিক্যেরও ত রাজকুলে জন্ম!"

রঘুপতি কহিলেন—"দেবতাদের স্বপ্ন ইঙ্গিত মাত্র; সকল কথা শুনা যায় না, অনেকটা য়া লইতে হয়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি দেবীর অসন্তোষ য়াছে, অসন্তোষের সম্পূর্ণ কারণও জন্মিয়াছে। অতএব দেবী যখন রাজরক্ত হিয়াছেন তখন বুঝিতে হইবে তাহা গোবিন্দ মাণিক্যেরই রক্ত।"

জয়সিং কহিলেন—"তা যদি সত্য হয় তবে আমিই রাজরক্ত আনিব—নক্ষত্রমাণিক্যকে পাপে লিপ্ত করিব না।"

রঘুপতি কহিলেন—"দেবীর আদেশ পালন করিতে কোন পাপ নাই।"

জয়সিং—"পুণ্য আছেত প্রভু! সে পুণ্য আমিই উপার্জ্জন করিব।"

রঘুপতি কহিলেন—"তবে সত্য করিয়া বলি বৎস। আমি তোমাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের অধিক যত্নে প্রাণের অধিক ভাল বাসিয়া পালন করিয়া আসিয়াছি, আমি তোমাকে হারাইতে পারিব না। নক্ষত্রমাণিক্য যদি গোবিন্দমাণিক্যকে বধ করিয়া রাজা য় তবে কেহ তাহাতে একটি কথা কহিবে না—কিন্তু তুমি যদি রাজার গায়ে হাত তোল ত তোমাকে আর আমি ফিরিয়া পাইব না।"

জয়সিং কহিলেন—"আমার স্নেহে! পিতা, আমি অপদার্থ, আমার স্নেহে তুমি একটি পিপীলিকারও হানি করিতে পাইবে না। আমার প্রতি স্নেহে তুমি যদি পাপে লিপ্ত হও তবে তোমার সে স্নেহ আমি বেশি দিন ভোগ করিতে পারিব না, সে স্নেহের পরিণাম কখনই ভাল হইবে না।"

রঘুপতি তাড়াতাড়ি কহিলেন "আচ্ছা, আচ্ছা, সে কথা পরে হইবে। কাল নক্ষত্রমাণিক্য আসিলে যা হয় একটা ব্যবস্থা হইবে!"

জয়সিং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমিই রাজরক্ত আনিব। মায়ের নামে, গুরুদেবের নামে ভ্রাতৃহত্যা ঘটিতে দিব না!"

ক্রমশঃ।

চিরঞ্জীবেষু। ১৮৭

ভায়া, দাদা মহাশয়দের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিতে পাও বলিয়া যে তাঁহাদের ভক্তি করিতে হইবে না, এটা কোন কাজের কথা নহে। দাদামহাশয়েরা তোমাদের চেয়ে এত বেশী বড় যে তাঁহাদের সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা করিলেও চলে। কেমনতর জান? যেমন ছোট ছেলে বাপের গায়ে পা তুলিয়া দিলে তাহাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না। কিন্তু তাহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে বাপের প্রতি সেই ছোট ছেলের ভক্তি নাই, অর্থাৎ নির্ভরের ভাব নাই, অর্থাৎ সে সহজেই বাপকে আপনার চেয়ে বড় মনে করে না। তোমরা তেমনি আমাদের কাছে এত ছোট যে আমরা নিরাপদে তোমাদের সহিত বেয়াদবি করিতে পারি এবং অকাতরে তোমাদের বেয়াদবি সহিতে পারি। আর একটা কথা; সন্তানের শুভাশুভ সমস্তই পিতার উপর নির্ভর করিতেছে, এই জন্য স্বভাবতই পিতার স্নেহের সহিত শাসন আছে এবং পুত্রের ভক্তির সহিত ভয় আছে;—পদে পদে কঠোর কর্ত্তব্যপথে সন্তানকে নিয়োগ করিবার জন্য পিতার আদেশ করিতে হয় এবং পুত্রের তাহা পালন করিতে হয়, এই জন্য পিতা পুত্রের মধ্যে আচরণের শৈথিল্য শোভা পায় না। এইরূপে পিতার উপরে কঠোর স্নেহের ভার দিয়া দাদামহাশয় কেবল মাত্র মধুর স্নেহ বিতরণ করেন এবং নাতি নির্ভয়-ভক্তিভরে দাদামহাশয়ের সহিত আনন্দে হাস্যালাপ করিতে থাকে। কিন্তু সে হাস্যালাপের মর্ম্মের মধ্যে যদি ভক্তি না থাকে তবে তাহা বেয়াদবির অধম। এত কথা তোমাকে বলিবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু তোমার লেখার ভঙ্গী দেখিয়া তোমাকে কিঞ্চিৎ সাবধান করিয়া দিতে হয়।

বাস্‌রে! আজকাল তোমরা এত কথাও কহিতে শিখিয়াছ! এখন একটা কথা কহিলে পাঁচটা কথা শুনিতে হয়! তাহার মধ্যে সব কথা যদি বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলেও এতটা গায়ে লাগিত না। ভাবের মিল থাকিলেও অনেক সময়ে আমরা পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারি না বলিয়া বিস্তর মনান্তর উপস্থিত হয়। আমি বুড়ামানুষ, তোমার কথা সমস্ত ঠিক বুঝিয়াছি কি না কে জানে, কিন্তু যেরূপ বুঝিলাম সেইরূপ উত্তর দিতেছি।

স্বকাল, পরকাল, এ এক নূতন কথা তুমি তুলিয়াছ। পরকালটা নূতন নয়—সমুখের একযোড়া দাঁত বিসর্জ্জন দিয়া অবধি ঐকালের কথাটাই ভাবিতেছি—কিন্তু স্বকাল আবার কি?

কালের কি কিছু স্থিরতা আছে না কি! আমরা কি ভাসিয়া যাইবার জন্য আসিয়াছি যে, কালস্রোতের উপর হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকিব? মহৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ কি স্রোতের মধ্যবর্ত্তী শৈলের মত কালকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে না!

আমরা পরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকি বলিয়াই একটা স্থির লক্ষ্যের প্রতি বেশী দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। নহিলে কিছুক্ষণ বাদে আর কিছুই ঠাহর হয় না—নহিলে আমরা পরিবর্ত্তনের দাস হইয়া পড়ি, পরিবর্ত্তনের খেলেনা হইয়া পড়ি। তুমি যেরূপ লিখিয়াছ তাহাতে তুমি পরিবর্ত্তনকেই প্রভু বলিয়াছ, কালকেই কর্ত্তা বলিয়া মানিয়াছ—অর্থাৎ ঘোড়াকেই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছ এবং আরোহীকেই তাহার অধীন বলিয়া প্রচার করিতেছ। কালের প্রতি ভক্তি এইটেই তুমি সার কথা ধরিয়া লইয়াছ, কিন্তু মনুষ্যত্বের প্রতি, ধ্রুব আদর্শের প্রতি ভক্তি তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

মনুষ্যের প্রতি প্রেম, পিতার প্রতি ভক্তি, পুত্রের প্রতি স্নেহ—এ যে কেবল পরিবর্ত্তনশীল ক্ষুদ্র কালবিশেষের ধর্ম্ম, এ কথা বলিতে কে সাহস করে! এ ধর্ম্ম সকলকালের উপরেই মাথা তুলিয়া আছে। "ঊনবিংশ শতাব্দীর" ধূলি উড়াইয়া ইহাকে চোখের আড়াল করিতে পার, তাই বলিয়া ফুঁয়ের জোরে ইহাকে একেবারে ধূলিসাৎ করিতে পার না।

যদি সত্যই এমন দেখিয়া থাক যে এখনকার কালে পিতা মাতাকে কেহ ভক্তি করে না, অতিথিকে কেহ যত্ন করে না, প্রতিবেশীদিগকে কেহ সাহায্য করে না—তবে এখনকার কালের জন্য শোক কর, কালের দোহাই দিয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিও না।

অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বর্ত্তমানকে সংযত করিতে হয়। যদি ইচ্ছা কর ত চোখ বুজিয়া ছুটিবার সুখ অনুভব করিতে পার, কিন্তু অবিলম্বে ঘাড় ভাঙিবার সুখটাও টের পাইবে।

বর্ত্তমান কাল ছুটিতেছে বলিয়াই স্তব্ধ অতীতকালের এত মূল্য। অতীতে কালের প্রবলবেগ প্রচণ্ডগতি সংহত হইয়া যেন স্থির আকার ধারণ করিয়াছে। কালকে ঠাহর করিতে হইলে অতীতের দিকে চাহিতে হয়। অতীত বিলুপ্ত হইলে বর্ত্তমান কালকে কেইবা চিনিতে পারে, কেইবা বিশ্বাস করে, তাহাকে সামলায় কাহার সাধ্য! কেন না, চিনিতে পারিলে জানিতে পারিলে তবে বশ করা যায়। যাহাকে জানিনা সে আমাদের প্রভু হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পরিবর্ত্তনশীল কালকে ভয় করিয়া চল, তাহাকে বশ করিতে চেষ্টা কর, তাহাকে নিতান্ত বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিও না।

যাহা থাকে না, চলিয়া যায়, মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তিত হয়, তাহাকে আপনার বলিবে কি করিয়া! এক খণ্ড ভূমিকে আপনার বলা যায়, কিন্তু জলের স্রোতকে আপনার বলিবে কে? তবে আবার স্বকাল জিনিষটা কি?

তুমি লিখিয়াছ, আমাদের সে কালে ব্যক্তির প্রতিই ভক্তি প্রীতি প্রভৃতি বদ্ধ ছিল, ভাবের প্রতি ভক্তি প্রীতি ছিল না। ব্যক্তির প্রতি ভক্তি প্রীতি কিছু মন্দ নহে সে খুব ভালই, সুতরাং আমাদের কালে যে সেটা খুব বলবান ছিল সে জন্য আমরা

লজ্জিত নহি। কিন্তু তাই বলিয়া যদি বল যে, ভাবের প্রতি আমাদের কালের লোকের ভক্তিপ্রীতি ছিল না তবে সে কথাটা আমাকে অস্বীকার করিতে হয়। আমাদের কালে দুইই ছিল, এবং উভয়েই পরস্পর বনিবনাও করিয়া বাস করিত। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের দেশে যে স্বামীপ্রীতি বা স্বামীভক্তি ছিল (এখনও হয়ত আছে) তাহা কি? তাহা কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতি বা ভক্তি নয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান, তাহা স্বামী নামক ভাবগত অস্তিত্বের প্রতি ভক্তি। ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ্য মাত্র, স্বামীই প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য ব্যক্তির ভাল মন্দের উপর ভক্তির তারতম্য হইত না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীই সমান পূজ্য। য়ুরোপীয় স্ত্রীর ভক্তিপ্রীতি ব্যক্তির মধ্যেই বদ্ধ, ভাবে গিয়া পৌঁছায় না। এই জন্য স্বামী নামক ব্যক্তিবিশেষের দোষগুণঅনুসারে তাহার ভক্তি প্রীতি নিয়মিত হয়। এই জন্যই সেখানে বিধবাবিবাহে দোষ নাই, কারণ সেখানকার স্ত্রীরা ভাবকে বিবাহ করে না, ব্যক্তিকেই বিবাহ করে, সুতরাং ব্যক্তিত্বের অবসানেই স্বামিত্বের অবসান হয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিগত সম্পর্কই এইরূপ সুগভীর ভাবের উপরে স্থায়ী।

কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেন, অন্যান্য বিষয় দেখ না। আমাদের ব্রাহ্মণেরা কি সমাজের হিতার্থে সমাজ ত্যাগ করেন নাই? রাজারা কি ধর্ম্মের জন্য বৃদ্ধবয়সে রাজ্য ত্যাগ করেন নাই (য়ুরোপের রাজারা তাড়া না খাইলে কখন এমন কাজ করেন ?)? ঋষিরা কি জ্ঞানের জন্য অমরতার জন্য সংসারের সমস্ত সুখ ত্যাগ করেন নাই? পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র যৌবরাজ্য ত্যাগ, সত্যরক্ষার জন্য হরিশ্চন্দ্র স্বর্গত্যাগ, পরহিতের জন্য দধীচি দেহত্যাগ করেন নাই? কর্ত্তব্য অর্থাৎ ভাবমাত্রের জন্য আত্মত্যাগ আমাদের দেশে ছিল না কে বলে? কুকুর যেরূপ অন্ধ আসক্তিতে মনিবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়, সীতা কি সেইভাবে রামের সঙ্গে সঙ্গে বনে গিয়াছিলেন, না মহৎ ভাবের পশ্চাতে মনুষ্য যেরূপ অকাতরে বিপদ ও মৃত্যুর মুখে ছুটিয়া যায় সীতা সেইরূপ ভাবে গিয়াছিলেন?

তবে কি ব্যক্তির প্রতি ও ভাবের প্রতি ভক্তি একই সময়ে থাকিতে পারে না? বর্ত্তমানের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, "পারে না" বলিয়া, এমন একটি রত্ন অবহেলায় হারাইও না। এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, কাহারও বা এক ভাবের প্রতি ভক্তি কাহারও বা আর এক ভাবের প্রতি ভক্তি। কেহ বা লৌকিক স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে, কেহ বা আত্মার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে পারে।

এ সকল কথা তোমাদের বয়সে আমরা বুঝিতে পারিতাম না ইহা স্বীকার করিতে হয়—কিন্তু তোমরা অনেক কুটকচালে কথা বুঝিতে পার বলিয়াই এতখানি বকিলাম।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীষষ্ঠিচরণ দেবশর্ম্মণঃ।

গান অভ্যাস।

রাগিণী ইমন্ ভুপালি—তাল কাওয়ালি।

এ কি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ!
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়নাথ,
প্রেম-উৎস উথলিল আজি—
বল হে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম, সকলি লও হে নাথ।

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

রিম্ ঝিম্ ঘন ঘনরে বরষে।
গগনে ঘনঘটা শিহরে তরুলতা,
ময়ূর ময়ূরী নাচিছে হরষে!
দিশি দিশি সচকিত, দামিনী চমকিত,
চমকি উঠিছে হরিণী তরাসে।

রাগিণী ইমন্ ভুপালি—তাল কাওয়ালি।

```
০             ১                    ২                 ৩
সা  —সা—সা—।  সা—ধা—সা—রে—। গা— — — — ।  পা০মা০পা—গা—ম— ॥
এ   কি এ      সু  ˉ  ন্দ  র   শো                     ভা
০             ১                   ২                ৩
গা০রে০গা—রে—রে—।  সা—ধা—সা—রে—। গা— — — — — । পা—পা—গা— — ॥
এ       কি এ       সু  ˉ  ন্দ  র  শো                  ভা
০                  ১                ২                 ৩
পা০মা০পা—গা—গা—। গা—গা—গা— —। পা—পা—মা—পা—। গা—রে—সা—রে—॥
কি        মু থ  হে রি এ
০                  ১                ২                 ৩
পা০মা০পা—গা—গা—। গা—গা—গা— — । পা—পা—মা—পা—। গা—রে—সা— —॥
কি         মু  থ   হে রি এ
০                 ১                ২                 ৩
সা— —ধা—সা—।  —রে—গা—গা—।  গা—গা—গা—গা—।  গা—গা—গা— — ॥
আ    জু মো        র ঘ রে      আ ই ল হৃ      দ য় নাথ
```

LITHO BY. H.C. HALDER

০ ১ ২ ৩
সা——ধা—ধা০পা০। মা০পা০পা—মা—গা—। পা০মা০পা—গা—ম—। গা—রে—
প্রে ম উ ৎ স উ থ লি ল আ
০ ১ ৪ ২
গা—রে— ঃ॥॥ সা——সা—সা—। সা—ধা—সা—রে— ॥॥ঃ গা—গা—গা—গা—।
আ জি এ কি এ সু ন্দ র ব ল হে প্রে
৩ ০ ১ ২
—ধা—পা—ধা— ॥ সা—সা—সা—সা—। সা০নী০সা—সা——। সা—ধা—ধা—ধা—।
ম ম য় হৃ দ য়ে র স্বা মী কি ধ ন
৩ ০ ১ ২
সা—সা—সা—নী— ॥ সা—রে—সা—নী—। ধা——পা—— ঃ॥ গা—পা—গা—গা—।
তো মা রে দি ব উ প হা র হৃ দ য় প্রাণ
৩ ০ ১ ২
—রে——— ॥ রে—রে—গা—পা—। পা—ধা—সা—সা—। সা—সা—গা—গা—।
ল হ ল হ তু মি কি ব লি ব যা হা
৩ ০ ১ ২
রে—রে—সা—সা— ॥ ধা—ধা—পা—পা—। গা—গা——ম—। গা——রে——।
কি ছু আ ছে ম ম স ক লি ল ও হে
৩
সা০রে০গা—গা—ম— ॥
নাথ

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

১ ১ ২ ৩
ধা—নি০ধা০পা—ধা০পা০। ম—পা—নী—নী—। সা—————। নী—রে—সা——— ॥
রিম্ ঝিম্ ঘ ন ঘ ন রে ব র ষে
০ ১ ২ ৩
রে——রে——। রে—রে—রে—রে—। রে—গ—রে—সা—। নী—রে—সা—— ॥
রিম্ ঝিম্ ঘ ন ঘ ন রে ব র ষে
০ ১ ২ ৩
ধা—নি০ধা০পা—ধা০পা০। ম—পা—নী—নী—। সা————। নী—রে—সা—— ॥ ঃ
রিম্ ঝিম্ ঘ ন ঘ ন রে ব র ষে

০ ১ ২ ৩
ম—ম—ম—ম—। পা—ম—পা০ধা০পা—। ম—গ—গ—ম—। রে—রে—সা—— ঃ॥ ॥
গ গ নে ঘ ন ঘ টা শি হ রে ত ক ল তা

০ ১ ২ ৩
নী—নী——নী—। সা—সা—সা——। নী—সা——সা—। নী—রে—সা—— ॥
ম য়ূ র ম য়ূ রী না চি ছে হ র যে

০ ১ ২ ৩
ধা—নি০ধা০পা—ধা০পা০। ম—পা—নী—নী—। সা—————। নী—রে—সা—— ॥
রিম্ ঝিম্ ঘ ন ঘ ন রে ব র ষে

০ ১ ২ ৩
ম—পা—নী—নী—। সা—সা—নী—সা—। রে—ম—রে—সা—। সা—সা—সা—সা— ॥ ॥ঃ
দি শি দি শি স চ কি ত দা মি নী চ ম কি ত

০ ১ ২ ৩
সা—নি—ধা—পা০ধা০। ম—পা—নী—নী—। সা————। নী—রে—সা——ঃ॥ ॥
চ ম কে উ ঠি ছে হ রি ণী ত রা সে

মাংস আহার।

অনেকের বিশ্বাস, মাংস আহার না করিলে বাঙ্গালী বলবীর্য্য কখনই লাভ করিতে পারিবে না। ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র। প্রথমতঃ, গরম দেশে মাংস খাওয়া কতদূর যুক্তিসংগত সেটি বিবেচনার বিষয়—তার পর, এখনকার বিজ্ঞান-বেত্তা অনেক বিচক্ষণ ডাক্তার এ কথা বলিয়া থাকেন, মাংস খাইবার অপকারিতা নষ্ট করিতে হইলে প্রচুর পরিমাণে শারীরিক পরিশ্রম করা উচিত। ইংরাজেরা মাংস খায় ও সেই পরিমাণে ব্যায়াম চর্চ্চাও করে। আমরা কি তাহা করি? আমরা হয় তো এক পেট মাংস খাইয়া, গের্দ্দা ঠেসান দিয়া তামাক সেবন করিতে করিতে সমস্ত দিন নিদ্রায় অতিবাহন করি। তা ছাড়া দেখা যায়, এসিয়া ও আফ্রিকার অনেক জাতি কেবল চাল ডাল প্রভৃতি শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে এবং য়ুরোপেও (ইংলণ্ডে নহে) অনেক চাষারা ও স্কটলণ্ডের হাইল্যাণ্ডরগণ অতি অল্প মাংস খায়। আমাদের হিন্দুস্থানীরা ডাল রুটি খায় অথচ কেমন তাহারা বলবান জাত—যুদ্ধের পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে য়ুরোপীয়দের চেয়ে কোন অংশে ন্যূন নহে বরং তাহারাই অগ্রে যুদ্ধে প্রাণ দেয়। কোন এক যুদ্ধে কতকগুলি ফরাসি

সেনা-নায়ক বন্দী হয়—এক বৎসর ধরিয়া (কিম্বা তারও অধিক) তাহারা আহারের মধ্যে কেবল ভাত ও মক্কা এবং পানীয়ের মধ্যে কেবল জল খাইয়া ছিল। তাহারা শীঘ্রই সুস্থ সবল হইয়া পদোন্নতি লাভ করিতে লাগিল এবং তাহাদিগের যে সকল সহচর প্রচুর মাংস আহার করিত তাহারা রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তাহাদের স্থান অধিকার করিল।

একজন অভিনব পর্য্যটক শ্রমশীল বলিষ্ঠ জাপানী স্ত্রী পুরুষদিগের বিষয় এইরূপ বলেনঃ—

"য়ুরোপের মাংসাহারী লোকেরা যে পরিমাণে আহার করে তাহার তুলনায় জাপানীরা কত অল্প খায়! তাহাদের শরীর গঠন দেখিলে মনে হয় যেন ইস্পাতের ন্যায় শক্ত। ঠাণ্ডাতেও তাহাদের কিছু অপকার করিতে পারে না—অত্যন্ত গরমেও তাহাদের অনিষ্ট হয় না। খুব প্রবল শীতের সময়েও তাহারা পাতলা কাপড় পরিয়া থাকে এবং প্রখর সূর্য্যের উত্তাপেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় না। তাহারা বলবীর্য্যের দৃষ্টান্তস্থল। তাহাদের দেখিলে এই কথাটাই সপ্রমাণ হয় যে মাছ তরকারি ভাত অল্প পরিমাণে খাইলেও স্বাস্থ্য বল ও সহিষ্ণুতা উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

তাহাদের পাল্কি বেহারার জাত "রিকিসা"-রাও যদিও চাষাদিগের ন্যায় তত বলবান দেখিতে নহে কিন্তু তাহারাও খুব মাংস-পেশী-বিশিষ্ট। আরোহীকে লইয়া ২০ ক্রোশ সমস্ত দিনে চলা তাহারা কঠিন ব্যাপার মনে করে না। খুব প্রখর রৌদ্রে খালি গায়ে হরিণের ন্যায় তাহারা দৌড়িয়া চলে। পথে এক পেয়ালা চা ও একটু ভাত মাত্র তাহারা আহার করে। এইরূপে প্রতিদিন তাহারা খাটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের শরীর গঠন অতি সুন্দর এবং যুবতী বৃদ্ধা সকলেই এত বৃহৎ বোঝা স্কন্ধে করিয়া এতদূর পথ চলিতে পারে যে সেরূপ করা মাংসাহারী য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকের সাধ্যাতীত। আসল কথা, পরিমিত আহার, নিয়মিত ব্যায়াম চর্চ্চা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, যথা সময়ে বিশ্রাম, মনের প্রফুল্লতা রক্ষা করা—ইহাই স্বাস্থ্য ও বলসঞ্চয়ের প্রকৃষ্ট উপায়।

বর্ষার চিঠি।

সুহৃদ্বর, আপনি ত সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্যে বাস করছেন। সেই অনাবৃষ্টির দেশে বসে একবার কলকাতার বাদলাটা কল্পনা করুন।

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাঙ্গলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম—আপনি বসে বসে ভাবুন।—ভরা পুকুর, আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া,

জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথ গাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দির স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুল্‌ছে; বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে, পাঠশাল ও গয়লাবাড়ির সাম্‌নে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্চে;—খুঁটিতে বাঁধা গরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চীৎকার করচে;—আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আস্‌চে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মত আমবাগান, তারপরে এক একটি করে বাঁশঝাড়, একেকটি করে কুটীর, একেকটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে আস্‌চে, কুটীরের দুয়ারে বসে ছোট ছোট মেয়েরা হাত-তালি দিয়ে ডাক্‌চে "আয় বৃষ্টি হেনে, ছাগল দেব মেনে"—অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেছে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়সড় কম্বলমোড়া মাঝির মাথায় অবিশ্রাম ঝর্‌ঝর্ বৃষ্টি পড়ছে। আর কলকতায় বৃষ্টি পড়চে আহিরিটোলায়, কাঁশারিপাড়ায়, টেরিটির বাজারে, বড় বাজারে, শোভাবাজারে, হরিকৃষ্ণর গলি, মতিকৃষ্ণর গলি, রামকৃষ্ণর গলিতে, জিগ্‌জ্যাগ্ লেনে—খোলার চালে, কোঠার ছাতে, দোকানে, ট্রামের গাড়িতে, ছ্যাক্‌ড়া গাড়ির গাড়োয়ানের মাথায় ইত্যাদি।

কিন্তু আজকাল ব্যাং ডাকে না কেন? আমি কলকাতার কথা বল্‌চি। ছেলেবেলায় মেঘের ঘটা হলেই ব্যাঙের ডাক শুনতুম—কিন্তু আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতা এল, সার্ব্ব-ভৌমিকতা এবং "উনবিংশ শতাব্দী" এল, পোলিটিকল্ অ্যাজিটেশন্, খোলা ভাঁটি এবং স্বায়ত্ত শাসন এল, কিন্তু ব্যাং গেল কোথায়! হায় হায়, কোথায় ব্যাস বশিষ্ঠ, কোথায় গৌতম শাক্যসিংহ, কোথায় ব্যাঙের ডাক!

ছেলেবেলায় যেমন বর্ষা দেখ্‌তেম, তেমন ঘনিয়ে বর্ষাও এখন হয় না। বর্ষার তেমন সমারোহ নেই যেন, বর্ষা এখন যেন ইকনমিতে মন দিয়েছে—নমোনমো করে জল ছিটিয়ে চলে যায়—কেবল খানিকটা কাদা, খানিকটা ছাঁট, খানিকটা অসুবিধে মাত্র—একখানা ছেঁড়া ছাতা ও চিনেবাজারের জুতোয় বর্ষা কাটান যায়—কিন্তু আগেকার মত সে বজ্র বিদ্যুৎ বৃষ্টি বাতাসের মাতামাতি দেখিনে। আগেকার বর্ষায় একটা নৃত্য ও গান ছিল একটা ছন্দ ও তাল ছিল—এখন যেন প্রকৃতির বর্ষার মধ্যেও বয়স প্রবেশ করেছে, হিসাব কিতাব ও ভাবনা ঢুকেছে, শ্লেষ্মা শঙ্কা ও সাবধানের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। লোকে বল্‌চে, সে আমারই বয়সের দোষ।

তা হবে! সকল বয়সেরই একটা কাল আছে; আমার সে বয়স গেছে হয়ত। যৌবনের যেমন বসন্ত, বার্দ্ধক্যের যেমন শরৎ, বাল্যকালের তেমনি বর্ষা। ছেলেবেলায় আমরা যেমন

গৃহ ভালবাসি এমন আর কোন কালেই নয়। বর্ষাকাল ঘরে থাক্‌বার কাল, কল্পনা করবার কাল, গল্প শোন্‌বার কাল, ভাইবোনে মিলে খেলা করবার কাল। বর্ষার অন্ধকারের মধ্যে অসম্ভব উপকথাগুলো কেমন যেন সত্যি হয়ে দাঁড়ায়। ঘনবৃষ্টিধারার আবরণে পৃথিবীর আপিসের কাজগুলো সমস্ত ঢাকা পড়ে যায়।—রাস্তায় পথিক কম, ভিড় কম, হাটে ঘাটে কাজের লোকের ঘোরতর ব্যস্ত ভাব আর দেখা যায় না—ঘরে ঘরে দ্বাররুদ্ধ, দোকান-পসারের উপর আচ্ছাদন পড়েছে—উদরানলের ইষ্টিম প্রভাবে মনুষ্যসমাজ যে রকম হাঁসফাঁস কোরে কাজ করে সেই হাঁসফাঁসানি বর্ষাকালে চোখে পড়ে না এই জন্যে মনুষ্য-সমাজের সাংসারিক আবর্ত্তের বাইরে বসে উপকথাগুলিকে সহজেই সত্য মনে করা যায়, কেউ তার ব্যাঘাত করে না। বিশেষতঃ মেঘ বৃষ্টি বিদ্যুতের মধ্যে উপকথার উপকরণ আছে যেন। যেমন মেঘ ও বৃষ্টিধারা আবরণের কাজ করে—তেমনি বৃষ্টির ক্রমিক একঘেয়ে শব্দও একপ্রকার আবরণ। আমরা আপনার মনে যখন থাকি তখন অনেক কথা বিশ্বাস করি—তখন আমরা নির্ব্বোধ, আমরা পাগল, আমরা শিশু; সংসারের সংস্রবে আসলেই তবে আমরা সম্ভব অসম্ভব বিচার করি, আমাদের বুদ্ধি জেগে ওঠে, আমাদের বয়স ফিরে পাই। আমরা অবসর পেলেই আপনার সঙ্গে পাগলামি করি, আপনাকে নিয়ে খেলা করি—তাতে আমাদের কেউ পাগল বলে না, শিশু বলে না—সংসারের সঙ্গে পাগলামি বা খেলা করলেই আমাদের নাম খারাপ হয়ে যায়। একটু ভেবে দেখ্‌লেই দেখা যায় বুদ্ধি বিচার তর্ক বা চিন্তার শৃঙ্খলা—এ আমাদের সহজ ভাব নয়, এ আমাদের যেন সংসারে বেরোবার আপিসের কাপড়—দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করবার সময়েই তার আবশ্যক—আপনার ঘরে এলেই ছেড়ে ফেলি। আমরা স্বভাব শিশু, স্বভাব পাগল, বুদ্ধিমান সেজে সংসারে বিচরণ করি। আমরা আপনার মনে বসে যা ভাবি—অলক্ষ্যে আমাদের মনের উপর অহরহ যে সকল চিন্তা ভিড় করে—সেগুলো যদি কোন উপায়ে প্রকাশ পেত! সংসারের একটু সাড়া পেয়েছি কি, একটু পায়ের শব্দ শুনেছি কি অমনি চকিতের মধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন করে নিই—এত দ্রুত যে আমরা নিজেও এ পরিবর্ত্তনপ্রণালী দেখ্‌তে পাইনে! তাই বল্‌ছিলেম যদি কোনমতে আমরা আপনার মনে থাক্‌তে পাই তাহলে আমরা অনেক অসম্ভবকে বিশ্বাস করতে পারি। সেই জন্যে গভীর অন্ধকার রাত্রে যা সম্ভব বলে বোধ হয় দিনের আলোতে তার অনেকগুলি কোন মতে সম্ভব বোধ হয় না—কিন্তু এমনি আমাদের ভোলা মন যে, রোজ দিনের বেলায় যা অবিশ্বাস করি রোজ রাত্রে তাই বিশ্বাস করি। রাত্রিকে রোজ সকালে অবিশ্বাস করি, সকালকে রোজ রাত্রে অবিশ্বাস করি! আসল কথা এই, আমাদের বিশ্বাস স্বাধীন, সংসারের মধ্যে পোড়ে সে বাঁধা পড়েছে—আমরা দায়ে পোড়েই অবিশ্বাস করি—একটু আড়াল পেলে, একটু ছুটি পেলে, একটু সুবিধা পেলেই আমরা যা' তা' বিশ্বাস করে বসি, আবার তাড়া খেলেই গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করি। নিতান্ত আপনার কাছে থাক্‌লে তাড়া দেবার লোক কেউ

থাকে না। বর্ষাধারার ক্রমিক ঝর্ঝর শব্দ সংসারের সহস্র শব্দ হতে আমাদের ঢেকে রাখে—আমরা অবিশ্রাম ঝর্ঝর শব্দের আচ্ছাদনের মধ্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে বিশ্রাম করবার স্বাধীনতা উপভোগ করি। এই জন্যই বর্ষাকাল উপকথার কাল। এই জন্য আষাঢ় মাসের সঙ্গেই আষাঢ়ে গল্পের যোগ। এই জন্যই বল্‌ছিলাম, বর্ষাকাল বালকের কাল—বর্ষাকালে তরুতলার শ্যামল কোমলতার মত আমাদের স্বাভাবিক শৈশব ফূর্ত্তি পেয়ে ওঠে—বর্ষার দিনে আমাদের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে।

তাই মনে পড়ে, বর্ষার দিন আমাদের দীর্ঘ বারান্দায় আমরা ছুটে বেড়াতেম—বাতাসে দুম্‌দাম করে দরজা পড়ত, প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছ তার সমস্ত অন্ধকার নিয়ে নড়ত, উঠোনে একহাঁটু জল দাঁড়াত, ছাতের উপরকার চারটে টিনের নল থেকে স্থূল জলধারা উঠোনের জলের উপর প্রচণ্ড শব্দে পড়ত ও ফেনিয়ে উঠ্‌ত, চারটে জলধারাকে দিক্‌হস্তীর শুঁড় বলে মনে হত। তখন আমাদের পুকুরের ধারের কেয়াগাছে ফুল ফুট্‌ত (এখন সে গাছ আর নেই)। বৃষ্টিতে ক্রমে পুকুরের ঘাটের এক এক সিঁড়ি যখন অদৃশ্য হয়ে যেত ও অবশেষে পুকুর ভেসে গিয়ে বাগানে জল দাঁড়াত—বাগানের মাঝে মাঝে বেলফুলের গাছের ঝাঁকড়া মাথাগুলো জলের উপর জেগে থাক্‌ত এবং পুকুরের বড় বড় মাছ পালিয়ে এসে বাগানের জলময় গাছের মধ্যে খেলিয়ে বেড়াত, তখন হাঁটুর কাপড় তুলে কল্পনায় বাগানময় জলে দাপাদাপি করে বেড়াতেম। বর্ষার দিনে ইস্কুলের কথা মনে হলে প্রাণ কি অন্ধকার হয়েই যেত, এবং বর্ষাকালের সন্ধেবেলায় যখন বারান্দা থেকে সহসা গলির মোড়ে মাষ্টার মহাশয়ের ছাতা দেখা দিত তখন যা মনে হত তা যদি মাষ্টারমশায় টের পেতেন তাহলে——। শুনেছি, এখনকার অনেক ছেলে মাষ্টারমশায়কে প্রিয়তম বন্ধুর মত জ্ঞান করে, এবং ইস্কুলে যাবার নাম শুনে নেচে ওঠে। এটা শুভ লক্ষণ বোধ হয়। কিন্তু তাই বলে যে ছেলে খেলা ভাল বাসে না, বর্ষা ভাল বাসে না, গৃহ ভাল বাসে না এবং ছুটি একেবারেই ভাল বাসে না,—অর্থাৎ ব্যাকরণ ও ভূগোলবিবরণ ছাড়া এই বিশাল বিশ্বসংসারে আর কিছুই ভাল বাসে না তেমন ছেলের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াও কিছু নয়। তেমন ছেলে আজকাল অনেক দেখা যাচ্চে। তবে হয় ত প্রখর সভ্যতা, বুদ্ধি ও বিদ্যার তাত লেগে ছেলেমানুষের সংখ্যা আমাদের দেশে ক'মে এসেছে, পরিপক্কতার প্রাদুর্ভাব বেড়ে উঠেছে। আমাদেরই কেউ কেউ ইঁচড়ে-পাকা বল্‌ত, এখন যে রকম দেখ্‌চি তাতে ইঁচড়ের চিহ্নও দেখা যায় না, গোড়াগুড়িই কাঁঠাল।